উপন্যাস

পায়ের তলার মাটি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

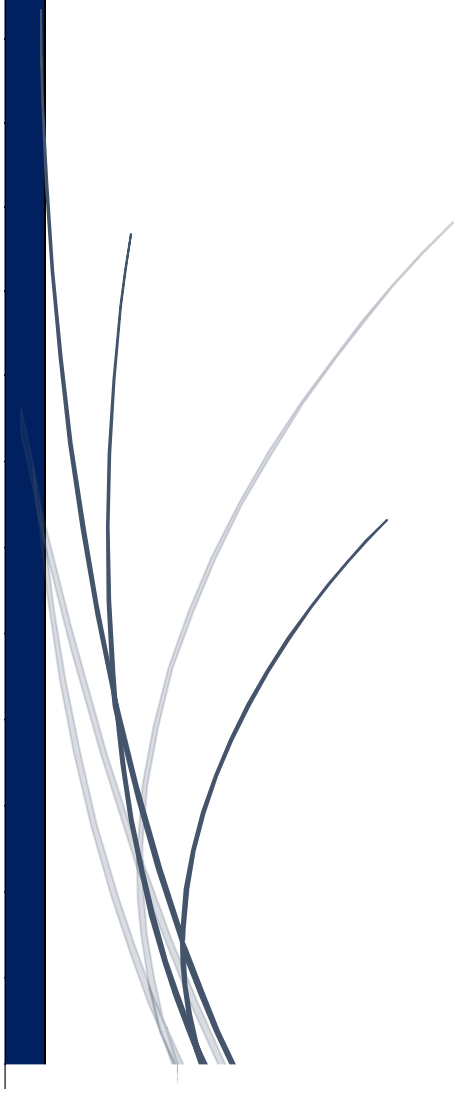

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. প্রথমে গুজবটা ছড়িয়েছিল 2
২. কুকুরগুলো যে বস্তুটি নিয়ে ঝগড়া করছিল 13
৩. বীথিকে নিয়ে ফিসফাস কানাকানি 23
৪. শরিকের আমবাগানে ভুবন..... 43
৫. বিহার থেকে নুটু..... 58
৬. পাছ পুকুরের জল 69
৭. অমাবস্যার রাত্রে চলাফেরা 87
৮. ডিপটিউব-ওয়েল থেকে সত্যি জল বেরিয়েছে..... 98
৯. নুটু বলল, তুমি যা বলছ দ্বারিকদা.....108
১০. আলুসেদ্ধ দিয়ে গরম ফেনাভাত 118
১১. সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে.....135

১. প্রথমে গুজবটা ছড়িয়েছিল

প্রথমে গুজবটা ছড়িয়েছিল অনেকটা নিরীহভাবে। কিন্তু কোনো কোনো গুজব হঠাৎ জীবন্ত প্রাণীর মতন হয়ে ওঠে। তারপর থেকে সে চলাফেরা করতে থাকে তার নিজস্ব নিয়মে।

গত দু-দিন কেউ আর সন্ধ্যের পর বেরোয়নি বাড়ি থেকে। বাজারের দোকানগুলো সাধারণত খোলা থাকে রাত ন-টা-দশটা পর্যন্ত, সেগুলোও অন্ধকার হতে-না-হতেই ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। কেউ তাদের বন্ধ করে দিতে বলেনি, কেউ তাদের ভয় দেখায়নি। দিনের বেলা গ্রামের রাস্তায় ছোটো জটলায় সকলেই বলে, দুর, এ কখনো আজকালকার দিনে সম্ভব! লোকেরও কাজ নেই, একটা উড়োকথার পেছনে...

কে প্রথমে ছড়িয়েছিল কথাটা, কেউ জানে না। অথচ গ্রামসুদ্ধ সবাই শুনেছে। এখন তো খবরই ছাপা হয়ে গেছে জেলাবার্তায়। ছাপার অক্ষরে আতঙ্ক শব্দটা দেখে সকলেই আতঙ্কিত হওয়ার ন্যায্য অধিকার বোধ করে। যদিও অনেকেই জানে যে, পরিমল মাস্টারের ভাগনে আজকাল জেলাবার্তায় খবর লেখে, তবু সাতখানি গ্রামজুড়ে আতঙ্ক– বড়ো কাঠের হরফে ছাপা দেখে যেন গা ছমছম করে।

পুলিশ আসার কথাও শোনা যাচ্ছে রোজই। মাত্র সাত মাইল দূরে ফাঁড়ি। অথচ সাতদিনের মধ্যেও এইটুকু রাস্তা পেরিয়ে আসতে পারলেন না বাবুরা। জল-কাদা নেই, শীতের শেষের শুকনো খটখটে রাস্তা, কোনোই অসুবিধে নেই যাতায়াতের। ছাপার অক্ষরে খবর বেরিয়ে গেছে, তবু পুলিশ আসছে না দেখে সত্যি রাগ ধরে যায়।

সেই সত্তর-বাহাত্তর সালে পুলিশ এই গ্রামে আসত খুব ঘন ঘন। একবার গুলি চালিয়েছিল পর্যন্ত। তখন বোঝা যেত, দেশে থানা-পুলিশ আছে। গত ক-বছর ধরে পুলিশ যেন ভুলেই গেছে এ গ্রামটার কথা।

কোনো কারণ নেই, তবু মনে হয়, পুলিশ এলে আসবে সন্ধ্যের পরই। মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে পুলিশের হাতের জোরালো টর্চ আর জিপগাড়ির হেডলাইটে তাদের উপস্থিতিটা বেশ সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলা অতটা না। সত্তর-বাহাত্তর সালের সময় পুলিশ আসত ভোর রাত্রে, চুপেচাপে। এখন তো আর সেরকমভাবে আসবার ঠেকা নেই।

পুলিশ এলে প্রথমেই যে খোঁজ করে দ্বারিকের, তা সবাই জানে। লোকে প্রথমে চেনালোকের কাছেই যায়। দ্বারিকের বাড়িতে এর আগে অন্তত দশবার পুলিশ এসেছে। দ্বারিক ছাড়া আর যে দু-জনকে চিনত পুলিশ, তারা এখন আর নেই।

দ্বারিকের বাড়ির ঠিক সামনে দিয়েই টানা রাস্তা। জানলা দিয়ে তাকালেই সোজা সেই তেঁতুলিয়ার মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। সন্ধ্যের পর পথ একেবারে শুনশান। একটা গোরুর গাড়ি পর্যন্ত চলে না। ঘুমে চোখ টেনে এলেও দ্বারিক চট করে শুতে যায় না, জানলা খুলে চেয়ে বসে থাকে। পুলিশের জন্য প্রতীক্ষা। পুলিশের হাঁকডাকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে লাফিয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আর দ্বারিক চায় না। সেসব যথেষ্ট হয়েছে।

এবাড়ির পাশেই একটা বেশ বড়ো পুকুর। কচুরিপানায় একেবারে ঠাসা। তার ওপাশে তিন শরিকের আমবাগান। সেই বাগান পেরিয়ে পুরোনো ইটের একতলা বাড়ি। সেখানে এখনও আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে সেই বাড়ি থেকে গ্রাম্য রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে উঠে আসছে একটা কান্নার আওয়াজ। বিটুর মা। ওই কান্নাটা শুনলেই দ্বারিকের ভুরু কুঁচকে যায়। কান্না সে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

দ্বারিকের টেবিলের ওপর ঘড়িটা থেমে আছে সাড়ে সাতটায়। সকালে দম দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, দ্বারিক নিজেই দিয়েছে। তাহলে কিছু রোগ হয়েছে ঘড়িটার। এখন ক-টা বাজে বোঝবার উপায় নেই। যদি রেডিয়োটা চালু থাকে তাহলে অবশ্য সময়টা মিলিয়ে নেওয়া যায়।

ঘড়িটায় দম দিতে দিতে দ্বারিক জানলার ধার ছেড়ে উঠে এল। ঘড়িটা আবার টিকটিক করছে। রেডিয়োটা এ ঘরেই থাকত আগে, দ্বারিক সেটা দিয়েছে বীথিকে। কিন্তু বীথিও

সেটা নিজের ঘরে রাখেনি। দ্বারিকের বাবাই সেটা শোনেন আজকাল। তিনি এখন প্রায় অথর্ব, চোখে কম দেখেন, কানে প্রায় শুনতেই পান না, তবু এই বয়সে হিন্দি গান শোনার এক দুর্দান্ত নেশায় পেয়ে বসেছে তাঁকে। শিশুর খেলনার মতন তিনি রেডিয়োটা আঁকড়ে ধরে থাকেন সর্বক্ষণ।

ঘুমন্ত বাবার শিয়রের কাছ থেকে রেডিয়োটা তুলে নিয়ে এল দ্বারিক। সেটাকে চালিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক কাঁটা ঘোরালো। গান-বাজনা শুনে সময় বোঝা যাবে না। ওটা চালানোই রইল, খবর হবে নিশ্চয়ই কখনো-না-কখনো।

আপনি খাবেন এখন?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। সরু লাল পাড়ের শাড়ি পরা, সাদা রঙের ব্লাউজ, সিথিতে স্পষ্ট করে দেওয়া সিঁদুর। রেডিয়োটা আনতে যাওয়ার সময় দ্বারিক দেখেছিল, বীথি তার নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে হ্যারিকেনের আলোয় বই পড়ছে। হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশুনো করার অভ্যেস নেই যাদের, তাদের নিশ্চয়ই নতুন করে মানিয়ে নিতে খুব অসুবিধে হয়। বীথি অবশ্য সে-কথা স্বীকার করে না।

হ্যাঁ, খেয়ে নিতে পারি। আজও পুলিশ আসবে না বোধ হয়।

আসুন, জায়গা করাই আছে। খেতে বসতে হবে দ্বারিককে একাই। মেঝেতে আসন পাতা, পাশে কাঁসার গেলাসে জল। অনেক বলে বলেও দ্বারিক ব্যবস্থা পালটাতে পারেনি। বাবা রাত্তিরে কিছু খান না, সন্ধ্যের সময়ই খানিকটা মুড়ি আর বাতাসা খেয়ে নেন পেটভরে, আর এক কাপ চা। বাকি থাকে আর তিনজন, মা, বীথি আর দ্বারিক। মা বাবর ছেলেদের খাবার আগে পরিবেশন করেছেন, নিজে খেতে বসেছেন পরে। বীথিও মার সঙ্গে পরে খায়। তিনজনে একসঙ্গে বসে খেয়ে নিলে যে আলোর খরচটা কম হয়, সেটা কিছুতেই বুঝবেন না মা।

পরিবেশন করারও কিছু নেই। রুটি, ডাল আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি। প্রত্যেকদিন রাত্রে এই একই খাবার। খেতে বসে দ্বারিকের প্রত্যেকদিনই অস্বস্তি হয়। তার অভ্যেস আছে, কিন্তু বীথি কী করে দিনের পর দিন এই খাবার খেয়ে যাচ্ছে? অথচ অন্য কোনো ব্যবস্থাও তো করবার উপায় নেই। টাকাপয়সার প্রশ্ন ছাড়াও, পাওয়াও তো যায় না কিছু। এ গ্রামের বাজারে মাসে একদিন-দু-দিন মাত্র মাংস ওঠে। আগে থেকে খবর পাওয়া যায় যে, রবিবার খাসি কাটা হবে। এমনি কোনো দিন হঠাৎ একটা খাসি কাটা হলে পুরো মাংস বিক্রি হওয়ার মতন খদ্দের জোটে না। মাছ এদিকে মেলেই না প্রায়। ধারে-কাছে নদী নেই। দু চারটে মজা-হাজা পুকুরে সারাদিন জাল ফেললেও মাছের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেদিন বাজারে বড়োমাছ ওঠে, সেদিন শহরের চেয়েও বেশি দাম হাঁকে। যারা টাকার অভাবের জন্য মাংস কেনে না, তারাও ধারধোর করে সেই মাছ কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে দ্বারিককে রণকালীপুর পেরিয়ে আসতে হয়। গ্রামটি মুসলমানপ্রধান। ওর আসল নাম রওনাক আলিপুর। কিন্তু লোকের মুখে মুখে রণকালীপুর হয়ে গেছে, অনেক মুসলমানও ওই নামই বলে। সে-গ্রামের বাজারে দ্বারিক গোরুর মাংস ঝুলতে দেখে রোজই। তিন টাকা কিলো।

দ্বারিক একদিন বীথিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি গোরুর মাংস খাও? বীথি উত্তর দিয়েছিল, খাইনি কখনো, ...তবে খেতে পারি। দ্বারিক বলেছিল, আমি যদি মাঝে মাঝে গোরুর মাংস কিনে আনি, তাতে তোমার আপত্তি আছে? মাকে অবশ্য জানানো হবে না–

বীথি বলেছিল, মাকে জানানো হবে না?

না, মা মেনে নিতে পারবেন না কিছুতেই। সে চেষ্টা করে আর লাভ নেই। ওঁকে বলতে হবে পাঁঠার মাংস, এমনিতে তো দেখে কিছু তফাত বোঝা যাবে না।

তারপর উনি যদি একদিন জেনে যান।

বীথির দৃষ্টিতে এমন একটা সারল্যের জোর আছে যে দ্বারিক আর কোনো কথা খুঁজে পায়। মায়ের পক্ষে জেনে যাওয়া খুবই সম্ভব। ভুবন হালদারের ছেলে দ্বারিক গোরুর মাংস কিনছে, এ খবর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চালাচালি হয়ে যাবে দু-চারদিনের মধ্যেই। কথাটা কোনোক্রমে কানে এলে মা প্রথমে জিজ্ঞেস করবেন বীথিকেই। আর বীথি তো মিথ্যে কথা বলবে না।

আপনি ডিম কিনে আনেন না কেন? আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়–

না, না, আমার জন্য নয়, তোমার জন্যই।

আমার তো কোনো অসুবিধে হয় না।

অসুবিধে হয় কিনা হয়, তা তো বীথি বলবে না মুখ ফুটে। হাঁস-মুরগির ডিম অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বীথি ডিম খায় না, তার অ্যালার্জির ধাত আছে। দ্বারিক নিজে ডিম ভালোবাসে, কিন্তু আজকাল পারতপক্ষে বাজার থেকে ডিম আনে না। বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বীথি, সে কোনো প্রোটিন খাবে না, আর দ্বারিক কি একলা ডিম খেতে পারে?

মোট ঠিক চারখানা রুটি খায় দ্বারিক। দু-খানা ডালে ডুবিয়ে। দু-খানা আলু-পেঁয়াজের তরকারি দিয়ে। তবু প্রত্যেকদিনই মা জিজ্ঞেস করবেন, আর রুটি নিবি না? নে, আরও আছে কিন্তু।

দ্বারিক দু-দিকে মাথা নাড়ায়।

একসময় সে দশ-বারো খানা রুটি খেত। স্কুলজীবনের শেষ থেকেই। এক ডেলা গুড় দিয়েই রুটি উড়িয়ে দিত পাঁচ ছ-খানা। জেলে থাকার সময় থেকেই তার খিদে মরে গেছে।

খাওয়া শেষ করে কাঁসার গেলাসের জলে চুমুক দিতেই আবার শোনা গেল বিটুর মায়ের কান্না। দ্বারিক ভুরু কোঁচকালো এবং বিষম খেল। মা বললেন, ষাট, ষাট।

মা বসে আছেন পাড় সেলাই করা আসনে। বীথি দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। গেলাসটা নামিয়ে রেখে দ্বারিক বলল, আজও বিটুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি?

মা একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আর খোঁজ পাওয়া যাবে কী করে? শুনছি নাকি মাটির নীচে পুঁতে রেখেছে।

কে পুঁতে রেখেছে?

তা কী জানি। বলাবলি তো করছে লোকে।

একটা নিরীহ ছেলেকে কে মাটির নীচে পুঁতে রাখতে যাবে?

মা চুপ করে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। এরমধ্যে মনে মনে কিছু কথা বলাবলি হল। এমন দিন গেছে, যখন জোয়ান জোয়ান ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে মরেছে। বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরেছে অন্য বন্ধুরা। কিংবা পুলিশ এসে শেয়াল-কুকুরের মতন পিটিয়ে বা গুলি চালিয়ে মেরেছে। অথবা থানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে পাঠিয়ে দিয়েছে নিরুদ্দেশে।

সেরকম দিন আর এখন নেই। এখন মারদাঙ্গার কথা কেউ বলে না। এমনকী পুলিশকে নিজে থেকে গিয়ে খবর দিয়ে এলেও পুলিশ সময় পায় না এদিকে আসবার।

দ্বারিক নিস্তব্ধতা ভেঙে আবার বলল, স্কুলের ছেলেরা বলে, তাদের কেউ কেউ নাকি দেখেছিল বিটুকে রাধিকাপুরের বাসে চাপতে।

মা বললেন, রাধিকাপুরে ওদের মামার বাড়ি। তারা ও-তল্লাট তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। যাবে কোথায় ছেলেটা? সঙ্গে পয়সাকড়িও কিছু ছিল না নাকি?

দেখো, কয়েকদিনের মধ্যেই ও ঠিক চিঠি লিখবে।

কথাটা বলেই দ্বারিক ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু আর ফেরাবার উপায় নেই।

মা সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ অভিমানের সঙ্গে বললেন, তাহলে আমাদের ভুত কেন চিঠি লেখে না?

আহা ওর ব্যাপারটা তো আলাদা।

হোক আলাদা। এখন তো আর কোনো ভয় নেই।

দ্বারিক চট করে আবার বীথির মুখটা দেখে নিল। বীথি শান্তভাবে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। যেন সে নিঃশব্দে বলতে চায়, তার জন্য চিন্তা করার কিছু দরকার নেই, দ্বারিক শুধু তার মায়ের কথাই চিন্তা করুক।

মা বললেন, তুই কলকাতায় যে খবর নিবি বলেছিলি?

দ্বারিক তাড়াতাড়ি হাত উঁচু করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু চুপ করো–

রেডিয়োতে গান থেমে ইংরেজি খবর শুরু হয়েছে। দ্বারিক বলল, দাঁড়াও, খবরটা শুনে নিই, যদি এখানকার কথা কিছু বলে।

খবর পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। তাতে ফিলিপিনস, অস্ট্রেলিয়া এমনকী বেইরুটের সংবাদও আছে। কোনো গ্রামের কথা কিছুই নেই, কোনোদিনই প্রায় থাকে না, তবু দ্বারিক পাঁচ মিনিট মাকে চুপ করিয়ে রাখে। কান্নার আওয়াজ পেলে দ্বারিক চটে যাবে বলে মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন এরমধ্যে। তারপর বললেন, তুই ওঠ, হাত ধুয়ে নে।

দ্বারিক এসে আবার জানলার ধারে বসল। রাস্তার ওপরে খুব নরমভাবে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। অনেক দূরে কয়েকটা কুকুর ডাকছে একটানা, আর কোনো শব্দ নেই। বিটুর মা বোধ হয় এবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঁর গলায় যে এত জোর, দ্বারিক জানত না এতদিন। বিটুর মাকে দ্বারিক লীলাবউদি বলে ডাকে। তার মনে আছে, লীলাবউদি যেদিন বিয়ের

পর প্রথম নতুন বউ হয়ে এলেন এ গ্রামে, তখন দ্বারিকের বয়েস দশ-এগারো, সেদিন খুব ঝড়-বৃষ্টি ছিল। গোরুর গাড়ি থেকে ধীরেনদা টোপর হাতে নিয়ে নেমে দাঁড়াবার পরও নতুন বউ নামতে খুব দেরি করছিল। কলাবউ-এর মতন একগলা ঘোমটা দিয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিলেন লীলাবউদি। পাড়ার মেয়েরা শাঁখ বাজিয়েই চলেছে, গুরুজনরা প্রণাম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে লাইন বেঁধে, তবু বউ আর নামেই না। শেষপর্যন্ত ধীরেনদাই তাড়া দিয়ে বললেন, কই, নামো, নিজেই তিনি বউয়ের হাত ধরে নামালেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল দ্বারিক। বউয়ের মুখ দেখে পাড়ার মেয়েরা জোরে নিশ্বাস টানার শব্দ করেছিল, হেসেছিল ঠোঁট টিপে। দ্বারিকও হেসেছিল। বউকে দেখতে সুন্দরী নয়, রং তো কালো বটেই, মুখখানাও কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। সকলেই আশা করে, নতুন বউমাত্রই সুন্দরী হবে। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ মেয়েই তো সুন্দরী নয়, তাদের কি বিয়ে হয় না? অনেকে সেদিনই বলেছিল, এ যে ঘোড়ামুখো বউ!

লীলাবউদি নিজের রূপ সম্পর্কে বড়ো বেশি সচেতন। লজ্জায় কোনোদিন কারোর সঙ্গে ভালো করে মুখ তুলে কথা বলেন না। কিন্তু মানুষটা বড়োই ভালো, মনটা খুব সাদা। কিছুদিন মেলামেশার পর দ্বারিকের আর মনেই পড়েনি যে লীলাবউদি রূপসী নন। ওঁর শান্ত, সুমিষ্ট কথা শুনতে খুব ভালো লাগে।

বীথি এ গ্রামে নতুন বউয়ের বেশে কখনো আসেনি। সে এসেছিল একলা। মল্লিকপুরে বাস থেকে নেমে লোকের কাছ থেকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করে করে সে এসে দাঁড়িয়েছিল এ বাড়ির দরজার সামনে।

রেডিয়োটা থামেনি এখনও, অর্থাৎ এগারোটা বাজেনি। আর একটু অপেক্ষা করেই শুয়ে পড়বে দ্বারিক। খাওয়া শেষ হলেও মা আর বীথি অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করে। এইবার বোধ হয় ওরা দু-জনে আঁচাতে গেল। বীথি রাত্তির বেলা পর্যন্ত জেগে থাকতে ভালোবাসে। শহরের মেয়েদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। এখানে ন-টা-দশটার মধ্যে সব বাড়ি নিঝুম হয়ে যায়।

রান্নাঘর ছাড়া এ বাড়িতে আর মাত্র দু-খানি ঘর ছিল। সবচেয়ে বড়োঘরখানা মা আর বাবার। তা ছাড়া কাঠের সিন্দুক থেকে শুরু করে গুচ্ছের পুরোনো জিনিসপত্র সবই সেই ঘরে জড়ো করা। বাকি ঘরখানা দ্বারিক আর ভুতো দু-জনের, ভুতো এখন নেই। বীথি আসবার পর তার শোবার জায়গা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রথম কিছুদিন বীথিকে এই ঘরখানাই ছেড়ে দিয়ে দ্বারিক শুত বড়োঘরটার মেঝেতে। এ ব্যবস্থায় বীথি আপত্তি করেছিল, দ্বারিকেরও অসুবিধে হচ্ছিল যথেষ্ট। এখন সামনের বারান্দাটার মাঝখানে দেওয়াল তুলে একটা আলাদা ছোটোঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বীথির জন্য। ওই ঘরটায় বাতাস ঢোকে না বেশি। এখন শীতের সময় তেমন বোঝা যাচ্ছে না, গরম পড়লে কষ্ট হবে খুব। ঘরের ভিত আর দেওয়াল পাকা হলেও টিনের ছাদ। গরমকালে ঘরের ভেতর মানুষদের একেবারে ঝলসানো অবস্থা হয়।

আপনার জল।

রাখো টেবিলের ওপর। তুমি কী খাচ্ছ? পান?

না, আমলকী। আপনি খাবেন?

খেতে পারি।

বাঁ-হাতের মুঠো খুলে হাতটা এগিয়ে দিল বীথি। দ্বারিক আলগোছে তুলে নিল দুটো টুকরো। মনে মনে একটু হাসল। মা দেখলে রাগ করতেন। বাঁ-হাতে করে কারোকে যে কোনো জিনিস দিতে নেই, বীথি সেটা খেয়াল করেনি। অবশ্য কোনো মানে হয় না এসবের, দ্বারিক জানে, তবু চোখে লাগে। গ্রামের কোনো মেয়ে এভাবে বাঁ-হাত এগিয়ে দিত না। অবশ্য, বীথির ডান হাতে জলের গেলাস ছিল।

এই যে রাত্তিরের জন্য এক গেলাস জল দিয়ে যাওয়া, এটাও নতুন। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে কদাচিৎ তেষ্টা পায়। সেরকম তেষ্টা পেলেও একটু বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের কলশি

থেকেও তো গড়িয়ে নিয়ে খাওয়া যায়। ছেলেবেলায় ঘুমচোখে এ-রকম কয়েকবার গেছে দ্বারিক। পেতলের কলশির শব্দ শুনেই মা জিজ্ঞেস করতেন, কে রে?

এখন বীথি রোজ রাত্তিরে দ্বারিকের শিয়রের পাশের টেবিলে এক গেলাস জল রেখে যায়। দ্বারিকের প্রয়োজন হয় না, তবু বীথিকে নিষেধ করেনি। সকালে উঠে অকারণেই খালিপেটে জলটা খেয়ে নেয়।

আপনার ঘর থেকে আর একটা বই নেব?

নাও। স্নো-র বইটা পড়া হয়ে গেছে?

সবটা পড়িনি। আপনার কাছে আর কোনো বাংলা বই নেই?

নেই বোধ হয়, আচ্ছা দেখি, কাল-পরশু যদি দু-একখানা আনতে পারি...আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে হয়তো...

দ্বারিকের বইয়ের সংগ্রহ খুব কম। সব মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশখানা মাত্র। জেলে থাকার সময় পয়সা জমিয়ে কিনেছিল কিছু। আবার অনেক বই হারিয়ে গেছে। একসময় ইচ্ছে করেই বিলিয়ে দিয়েছিল অন্যদের। গল্প-উপন্যাস নেই একখানাও।

বীথি ঠিক কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে, তা এখনও জানে না দ্বারিক। খুব কম কথা বলে বীথি। দ্বারিকও আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু বীথির খুব পড়ার নেশা। হ্যারিকেনের আলোতেও কষ্ট করে সে অনেক রাত জেগে পড়ে। এ-রকমভাবে পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যেতে পারে, দ্বারিক একবার বারন করবে ভেবেছিল। কিন্তু বীথি যদি ভাবে যে দ্বারিক কেরোসিন তেলের খরচ বাঁচাবার জন্য বলছে!

বীথি চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল দ্বারিক। আজকাল সবচেয়ে ভালো লাগে ঘুমের সময়টা। ঘুমের মতন উপভোগ্য আর কিছু নেই। শরীর এখন ঘুম চায়।

বিছানায় শোয়ার পরই কিছুক্ষণ খুব কাশি হয়। বসে থাকলে বা দাঁড়িয়ে থাকলে হয় না, কিন্তু শরীরটা হরাইজনটাল হলেই শুরু হয় কাশির দমক, খুবই বিশ্রী ব্যাপার। দু-বার তিনবার সিরাপ খেলে খানিকটা কমে। ব্রঙ্কাইটিস বা টি বি নেই, শুধু এই এক অদ্ভুত কাশি। শুকনো।

কাশির জন্য তার ঘোর ভেঙে যায় মাঝে মাঝে। এক-একবার উঠে বসে। আবার অগভীর ঘুমের মধ্যে মনে হয়, সে যেন পুলিশের জিপের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, থেমে পড়ার পরও জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজ, ভারী ভারী বুট-পরা পুলিশের পা।

একবার দ্বারিক সেই ভ্রমকে সত্যি মনে করে, ধড়মড়িয়ে উঠে জানলার কাছে এল। না, কিছু নেই। সেইরকমই ফাঁকা রাস্তা। নরম জ্যোৎস্নায় চুপচাপ শুয়ে আছে। এমন নির্জন নিস্তব্ধ পথ দেখলে বড়ো মায়া হয়।

হ্যারিকেনের লালচে আলোর একটা শিখা গিয়ে পড়েছে বাড়ির সামনের উঠোনে। অর্থাৎ বীথি এখন জেগে আছে, পড়ছে। পড়ুক।

আবার এসে শুয়ে পড়ল দ্বারিক। বেশ কিছুক্ষণ আর কাশি হল না। আস্তে আস্তে চোখের পাতায় নেমে এল ঘুম। একেবারে তলিয়ে যাওয়ার আগে দ্বারিকের মনে হল, দূরে কুকুরগুলো বড়ো বেশি জোরে ডাকাডাকি করছে। দুটো-চারটে নয়, একসঙ্গে বহু কুকুর। পৃথিবীতে এখন কুকুরের চিৎকার ছাড়া আর কিছু নেই।

কুকুরগুলোর প্রচন্ড দাপাদাপিতে গ্রামের আরও অনেকেরই ঘুম ভেঙেছিল। কেউই রাত্তিরে উঠে কারণ অনুসন্ধান করতে যায়নি। ভোর বেলা কয়েকজন তেঁতুলিয়ার মোড়ে গিয়ে দেখতে পায় এক চমকপ্রদ দৃশ্য। তারপরই হুলুস্থুলু পড়ে যায় গোটা গ্রামজুড়ে।

২. কুকুরগুলো যে বস্তুটি নিয়ে ঝগড়া করছিল

কুকুরগুলো যে বস্তুটি নিয়ে ঝগড়া করছিল, সেটা একটি মানুষের মুন্ডু। এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত যে চেনবার আর উপায় নেই কোনো। তবু অনেকেরই ধারণা, সেটি কোনো পূর্ণবয়স্ক মানুষের নয়, বারো-তেরো বছরের কোনো কিশোরের। যে-গুজবটা কয়েকদিন ধরে ধোঁয়াচ্ছিল, দপ করে সেটায় আগুন জ্বলে উঠল। আগে ছিল ছেলে চুরি, এখন সেটা হল নরবলি।

পুলিশ এল দুপুর বেলা। একজন এএসআই দু-জন কনস্টেবল। জিপে আসেনি, হেঁটে এসেছে। তেঁতুলিয়ার মোড়ে সাংঘাতিক ভিড়, পাশের দু-খানা গ্রাম থেকেও ছুটে এসেছে মানুষ।

দ্বারিক সকালে একবার অকুস্থল ঘুরে দেখে এসেছিল। মাথাটা যে মানুষেরই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিটুরই কিনা, তা লীলাবউদিও বলতে পারবেন না বোধ হয়।

দ্বারিক আর স্কুলে গেল না। বসে রইল বাড়িতেই। পুলিশের প্রতীক্ষায়। তার শরীরটা আজ আবার খারাপ লাগছে। শরীর খারাপ হলেই আজকাল মনটাও বিবশ হয়ে যায়। আজ মনে হয়, পৃথিবীতে যা ঘটে ঘটুক, আমি শুয়ে থাকি।

দু-ঘণ্টার মধ্যেও পুলিশ তার কাছে এল না দেখে দ্বারিক একটু অপমানিতই বোধ করল। শুধু ব্লক থানায় নয়, সদর পুলিশ, এমনকী কলকাতার গোয়েন্দা দফতরও দ্বারিক হালদারকে চেনে। তার নিজের পরিচয়ে তো বটেই, তা ছাড়া তার ভাই অম্বিকা হালদার। অন্তত দশবার পুলিশ এসেছে এবাড়িতে। আর আজ তাকে বাদ দিয়ে পুলিশ এ গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে!

আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দ্বারিক বলল, যাই, একটু দেখে আসি।

মা অমনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছিস? না তোকে আর ওই গোলমালের মধ্যে যেতে হবে না!

দ্বারিক হাসল। মা এখনও সেই আগেকার দিনের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন। যেন পুলিশ আবার দ্বারিককে দেখলেই ঝপ করে ধরে নিয়ে যাবে। মা জানেন না, গত মাসে মল্লিকপুরের হাটে যখন গোলমাল হল, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল তিনজন ছাত্রকে, তখন দ্বারিকই থানায় গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে এনেছিল। এ গ্রামের লোকদের যাতে পুলিশ এসে অযথা হয়রানি না করে, দ্বারিক সেটাই দেখতে যাচ্ছে।

তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা। পুলিশরাই আজকাল আমাকে ভয় পায়।

তবু, তোর যাওয়ার দরকার কী? কে আবার নজর দিয়ে দেবে!

নজর দেবে? কে, কীসের নজর দেবে?

বলা কী যায়?

দ্বারিক দেখল, বীথি ঠোঁট টিপে হাসছে। মায়ের যত অদ্ভুত কথা। সে যেন একটা বাচ্চা ছেলে! নজর দেবে মানেটা কী?

বাড়ির বাইরে পা দিয়ে সে বলল, খানিকক্ষণের জন্যে ঘুরে আসছি!

বুক ব্যথার জন্যে যে মানসিক জড়তা এসেছিল, সেটা কাটিয়ে ফেলার জন্যই দ্বারিক জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। এবং খানিক দূরে গিয়ে ধরালো একটা সিগারেট, যা তার মতন বুক-ব্যথা ও কাশির রুগির পক্ষে এখন প্রায় বিষপানের সমান। দ্বারিকের বয়স এখন তিরিশ, কিন্তু দেখায় ছত্রিশের মতন।

তেঁতুলিয়ার মোড়ে ভিড়টা দেখে দ্বারিক অবাক হয়ে যায়। এ গ্রামে একসঙ্গে এত মানুষের সমাবেশ সে কখনো দেখেনি। দ্বারিকের দুঃখ বোধ হল। একটা যেকোনো হুজুগে এখনও এত লোক মেতে ওঠে। অথচ একটা কাজের জন্য ডাকলে আসবে না। মৃত্যু নিয়ে এত কৌতুহল, যদি এর অর্ধেকও জীবন সম্পর্কে থাকত।

চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। মাঝে মাঝে একজন সেপাই চেঁচিয়ে উঠছে, আস্তে আস্তে।

গ্রামের বুড়োরাই এখানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে শোনা যাচ্ছে মহাদেব সাহার গলা। মনে হচ্ছে যেন পুলিশকে তিনি খুব ধমকাচ্ছেন।

দ্বারিকের প্রথমেই দৃষ্টি গেল একটা গাছের দিকে। তার রাগ হল।

এই গাছটা একটা আশ্চর্য দৃশ্য। কলকাতার ফোটোগ্রাফারদের উচিত ছিল এই গাছটার ছবি তুলে নিয়ে বড়ো করে কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া। দেশ-বিদেশের লোক এটা দেখতে আসত তাহলে।

ওটা একটা মাঝারি আকারের অশ্বত্থগাছ। এমনিতে দ্রষ্টব্য কিছু ছিল না। কিন্তু গত বছর ওটা ঝড়ে উলটে পড়ে যায় পাশের ডাোবাটায়। শেকড়গুলো উপড়ে গেছে, ডালপালাসুদ্ধ গুঁড়ির অর্ধেকটা পড়েছে জলে। ওইভাবেই পড়ে থেকে গাছটার একদিন পচে যাওয়ার কথা ছিল। তেঁতুলিয়ার মোড়ের অনেকটা জমি এজমালি সম্পত্তি। এখানে তেঁতুল-বটের বিয়ে হয়েছে, আর সেই দম্পতিগাছের গোড়ায় ধর্মঠাকুরের থান আছে বলে কেউ এখানকার গাছপালা কাটে না। শুধু ধর্মঠাকুর নয়, আরও নানারকম মূর্তিও ক্রমে ক্রমে বসেছে এখানে। এটাই এ গ্রামের বারোয়ারি পুজোর জায়গা, এখানে চন্ডীমন্ডপ নেই।

কিন্তু ঝড়ে উলটেপড়া অশ্বত্থগাছটা একটা অদ্ভুত খেলা দেখালো। কয়েকটা শেকড় বোধ। হয় হেঁড়েনি, লেগেছিল মাটির সঙ্গে, বাকি শেকড়গুলো ব্যাকুল আঙুলের মতন বাতাস আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে ঝুলছিল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই অশ্বত্থগাছটা আবার একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। অলৌকিক দৃশ্যের মতন মনে হয়। একটা শুয়ে থাকা গাছ আবার

উঠে দাঁড়াতে চাইছে, এ-রকম আগে কেউ কখনো দেখেনি। গাছটা তার মৃত্যুকে প্রত্যাখান করতে চায়। সামান্য যে ক-টা শেকড় লেগেছিল মাটির সঙ্গে, তারাই যেন প্রাণপণে ওকে টানছে। এখনও বেশ খানিকটা হেলে থাকলেও জল থেকে অনেকটা উঠে এসেছে উঁচুতে। দ্বারিক যাওয়া-আসার পথে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে যায় এই অশ্বত্থাগাছটার পাশে। গাছটার বেঁচে থাকার অদ্ভুত জেদ দেখতে তার ভালো লাগে। এখনও মাটির সঙ্গে তিরিশ ডিগ্রি কোণ করে ঝুঁকে আছে গাছটা, কিন্তু আর কয়েক মাসের মধ্যেই ও সোজা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে আবার।

দূর থেকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না বলে, সাত-আটটা ছেলে সেই অশ্বত্থাগাছটার গুঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাচ্ছলে দোলাচ্ছে পা দিয়ে। আর দু-একটা ছেলে উঠলেই নিশ্চয়ই গাছটার শেকড় ছিড়ে আবার জলে পড়ে যাবে।

দ্বারিক ওদিকে গিয়ে কড়া গলায় বলল, এই, মো! নামো এখান থেকে।

ছেলেগুলো দ্বারিকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করল। অন্য গ্রামের ছেলে হলেও ওরা দ্বারিক হালদারকে চেনে। এজমালি সম্পত্তির গাছ। তার ওপরে কেউ উঠলে দ্বারিকের চোখ রাঙানোর অধিকার নেই। কিন্তু কিছুদিন আগেও আশেপাশের সাতখানা গ্রামের কোনো ছেলের সাধ্য ছিল না দ্বারিক হালদারের কথা অমান্য করার। এখন তারা দু-একবার গা মোচড়ালো। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল একটুক্ষণ।

দ্বারিক আরও বেশি জোর দিয়ে বলল, মো বলছি!

ছেলেগুলো শেষপর্যন্ত প্রতিবাদ করল না, নেমে এল। তারপর তারা গাছটার গোড়ার দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার করে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। গাছটার অস্বাভাবিক কান্ডকারখানার জন্যে এর মধ্যেই ওর গোড়ায় সিঁদুর লেপা শুরু হয়ে গেছে, রয়েছে কয়েকটা ঘট আর ফুল বেলপাতা। ছেলেগুলো যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল, দ্বারিকের কথায়

নয়, পুজোর গাছ বলেই ওরা নেমে গেল। এজন্য আবার রাগ এসে পড়লেও সেটা হজম করতে হল দ্বারিককে।

তাদের পাড়ার ছেলে দুলালকে কাছাকাছি দেখে দ্বারিক বলল, এই, এর ওপর লোকজন উঠছে, বারন করতে পারিসনি?

দুলাল বলল, বারন করেছিলাম, দ্বারিকদা! ওরা মস্তানি করছিল।

আর একজন কে বলল, পুলিশ যেন কেসটা উড়িয়ে দিতে চাইছে। আপনি একটু কথা বলুন না, দ্বারিকদা!

আরও দু-তিনজন বলল, এই জায়গা দাও, দ্বারিকদাকে ভেতরে যেতে দাও!

এ এস আই-টি নতুন। দ্বারিক একে আগে দেখেনি। কে যেন তাকে একটা চেয়ার এনে দিয়েছে। অল্পবয়সি ছোকরা। বিভিন্ন থানার লোকজনকে পাইকারিভাবে ট্রান্সফার করা হয়েছে গত এক বছরে। জেল থেকে যারা বাড়ি ফিরেছে, তারা যাতে পুরোনো অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের আর দেখতে না পায়।

মহাদেব সাহা বললেন, এই যে দ্বারিক, এসো, এসো।

তারপর এ এস আই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এর নাম দ্বারিক হালদার, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। পাঁচটা কেস ছিল।

এ এস আই-টি খানিকটা সম্ভ্রম দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, নাম শুনেছি, নিশ্চয়ই... আমার নাম সমর দাস।

সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসার থেকেই আসে, একথা জেনেও দ্বারিক কিছুতেই ওদের কারুকে সহ্য করতে পারে না। পুলিশ দেখলেই তার মধ্যে একটা

পুরোনো ক্রোধ ফিরে আসে। ওরাই তো মেরে মেরে তার শরীরটাকে একটা ভগ্নপ করে দিয়েছে।

দ্বারিক আড়চোখে দেখে নিল যে কাটা মুণ্ডুটার ওপর কে যেন চাপা দিয়ে রেখেছে একটা চটের থলি। তাতে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

মহাদেব সাহা বললেন, দেখো তো, কী কান্ড না কী কান্ড! যদি আবার সেই আগের মতন কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়।

সাত বছর আগে মহাদেব সাহাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল দু-দুবার। দু-বারই উনি অতিএকটুর জন্য বেঁচে যান। মহাদেব সাহা খুন হলে দ্বারিক এখনও একটুও দুঃখিত বোধ করত না।

দ্বারিক জিজ্ঞেস করল, বডি কোথায়? বডির কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?

সমর দাস বলল, দেখুন, আমার ধারণা, এটা খুনটুনের কেস নয়, অনেক সময়...

অমনি একসঙ্গে ভিড়ের মধ্যে অনেকে চিৎকার করে উঠল। একজন সেপাই বলল, আস্তে আস্তে!

মহাদেব সাহা প্রতিবাদকারীদের নেতৃত্ব দিয়ে বললেন, মানুষের কাটা মুণ্ডু রাস্তায় গড়াচ্ছে, তবু আপনারা বলবেন, খুন নয়? ধান কাটার হাঙ্গামা নিয়ে কেস লেখাতে গেলে আপনারা আজকাল কেস লেখেন না। গত মাসে আমার বাড়িতে অতবড়ো চুরি হয়ে গেল...।

ধৈর্যচ্যুতি হলেও সমর দাস বিনীতভাবে বলল, আপনি একটু থামুন। আমি দ্বারিকবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।

আরে মশাই, এর পর ছেলেপুলেগুলোকে কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেই সাহস পাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলে চুরি হচ্ছে।

এই তো, সেই কথাটাই বলতে দিচ্ছেন না। বুঝলেন দ্বারিকবাবু, আশেপাশে ক-খানা গাঁ ধরে ছেলে চুরির গুজব কারা ছড়াচ্ছে জানি না, কিন্তু একদম ফলস, কোনো ভিত্তিই নেই, এই একটা কেস ছাড়া আর কেউ থানায় ডায়েরি করেনি, কোনো নির্দিষ্ট বাড়ির কোনো ছেলে চুরি গেছে বা হারিয়েছে বলে জানা যায়নি...

দ্বারিক বলল, কিন্তু আমাদের পাড়ার একটি ছেলে দিন সাতেক ধরে সত্যিই নিখোঁজ।

সমর দাস সিনেমার পুলিশ অফিসারদের মতন ভুরু তুলে কথা বলে। গোঁফটা ঠোঁটের পাশে সবেমাত্র কুন্ডলী পাকাতে শুরু করেছে।

সেই তো বললাম, এই একটা কেস ছাড়া। পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালানো কি অস্বাভাবিক ঘটনা? প্রতি বছরই একটা-দুটো হয় এ-রকম, আবার ফিরেও আসে।

পুলিশের কাছে সব কিছুই ছক-বাঁধা। উঠতি বয়েসের ছেলেদের পক্ষে হঠাৎ বাড়ি থেকে পালানো সত্যিই অস্বাভাবিক কিছু নয়। পরীক্ষায় ফেল করে দু-চারদিন এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকে মারের ভয়ে। সবই ঠিক। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে মেলে না। বিটুর মতন অতি নিরীহ, শান্ত, ভালো মানুষ ছেলেরা পালায় না। বিটু তার দুঃখিনী বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, সে কেন পালাতে যাবে? অনেক ছেলেই ফেল করে সব সাবজেক্টে বিটু মাত্র অঙ্ক আর ইংরেজিতে, একটু ধরাধরি করলেই ওকে প্রোমোশন দেওয়ানো যেত।

বিটুদের মতন ছেলেরা ঝোঁকের মাথায় পালায় না। সমর দাস তো বিটুকে দেখেনি, তাই বুঝবে না।

সমর দাস পাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি, উনি আসতে পারবেন না?

বলাইকাকা বললেন, শুনছি এখনও জ্ঞান ফেরেনি। লোক পাঠানো হয়েছে।

দ্বারিক এদিক-ওদিক চেয়ে, এত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও একজন মানুষের অনুপস্থিতি লক্ষ করল। গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই, তিনি এলে তাঁকে দেখা যেতই। শুধু যে লম্বা-চওড়া পুরুষ তাই নন, ব্যক্তিত্বেও এ গ্রামের মধ্যে তিনিই প্রধান। অবশ্য তিনি অহংকারী মানুষ, না ডাকা হলে তিনি নিজের থেকে আসবেন না।

ডিপটিউবওয়েলের পাশে রক্তের ছোপ রয়েছে। এখনও রয়েছে।

মহাদেব সাহার এই কথার সমর্থনে বলাইকাকা বললেন, হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।

দ্বারিক বলল, রক্ত? কই, আমি তো দেখিনি। কালও গিয়েছিলাম।

মহাদেব সাহা বলল, ওটা রক্ত কিনা, বা রক্ত হলেও মানুষের রক্ত কিনা, সেটা দেখতে হবে। খানিকটা মাটি নিয়েছি।

আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে চিঠি লিখব।

দ্বারিক বলল, ডিপটিউবওয়েলের কাছে রক্ত, আর মুন্ডুটা এত দূরে...

কুকুরে নিয়ে এসেছে।

তাহলে বডিটা?

সমর দাস দ্বারিকের দিকে ফিরে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, দেখুন, আমার প্রথম পোস্টিং হয়েছিল ঝাড়গ্রামে, ওখানে এখনও প্রায়ই নরবলির গুজব ওঠে, হয়তো কিছুটা সত্যতাও আছে...

একবার এনকোয়ারিতে গিয়ে একটা মন্দিরের সামনে শুধু একটা বডি পেয়েছিলাম, মুন্ডু ছিল না...অনেক খুঁজেও সেটা আর পাইনি, মুন্ডুটাই লুকিয়ে ফেলে, যাতে

আইডেন্টিফিকেশন নাহয়...সেটাই বেশি ইয়ে, মানে, এতবড়ো একটা বডি লুকোবার চেয়ে।

এই মুখটা দেখেও তো চিনতে পারার উপায় নেই।

সেইজন্যই আমার ধারণা...অনেক সময় কবরখানা থেকে শেয়ালগুলো এ-রকম তুলে আনে...পাশেই মুসলমানদের গ্রাম...বিরাট কবরখানা...

সেখানে কোনো কবর খোঁড়া হয়েছে কিনা দেখলেই তো হয়।

তাই তো যেতে চাইছি, কিন্তু এনারা বলছেন—

মহাদেব সাহা বলল, বুঝলে দ্বারিক, এইসব বলে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়া হবে। পুলিশ আজকাল কোনো ঝাটেই যেতে চায় না।

সমর দাস এমনভাবে দ্বারিকের মুখের দিকে চেয়ে রইল, যার অর্থ, একমাত্র দ্বারিক ছাড়া আসল কথাটা কেউ বুঝবে না। মহাদেব সাহাও দ্বারিকের পাশে এসে দাঁড়াল, যেন পুলিশের বিরুদ্ধে যেকোনো কথাবার্তায় সে দ্বারিকের সমর্থন পাবেই।

দ্বারিক বলল, ডিপটিউবওয়েলের পাশে রক্ত-ওখানেই বলি দেওয়া হয়েছে বলছেন?

দু-বার খুঁড়েও জল বেরোয়নি! ওরা রিগ ফেরত নিয়ে যাবে বলছিল।

এই সময় আবার একটা হইহই চিৎকার উঠল। ভিড় ফাঁক হয়ে গেল মাঝখানে। দ্বারিক দেখল, তাদের বাড়ির দিক থেকে আসছেন লীলাবউদি, তাঁর দু-হাত ধরে আছে সুরেন আর বিষ্ণু। লীলাবউদির আচ্ছন্নের মতন অবস্থা, তিনি চোখ বুজে প্রায় দৌড়োচ্ছেন।

অজান্তেই ঠোঁটটা বেঁকে গেল দ্বারিকের। মানুষের ভন্ডামির শেষ নেই। ওই বিষ্ণুটা অসহায় বিধবা লীলাবউদির নামে মামলা করছে। গতমাসেও একদিন লীলাবউদির উঠোনে

দাঁড়িয়ে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল। আজ সেই আত্মীয় সেজে লীলাবউদির হাত ধরে আছে।

বলাইকাকা বললেন, ওই যে বউমা আসছে, একবার নিজের চোখে দেখুক।

দ্বারিক বিরক্তভাবে বলল, এর কি কোনো দরকার ছিল?

সমর দাস বলল, যদি উনি আইডেন্টিফিকেশন করতে পারেন, একবার দেখে নিন।

মহাদেব সাহা বলল, আমরা চিনতে না পারলেও মায়ের প্রাণ, ঠিকই পারবে।

দ্বারিক চঞ্চল হয়ে উঠল। এক্ষুনি এখানে বিরাট কান্নাকাটি শুরু হবে। সে শুনতে চায় না, সে এখানে থাকতে চায় না। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল উলটো দিকে। রাস্তা ছেড়ে নেমে সে সদ্য ধানকাটা খড়খড়ে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল মল্লিকপুরের দিকে।

৩. বীথিকে নিয়ে ফিসফাস কানাকানি

বীথিকে নিয়ে ফিসফাস কানাকানি আজও থামেনি মোরামডাঙায়।

বীথি একলা রাস্তায় বেরোলেই টের পায় নানা দিক থেকে কৌতুহলী চোখ তাকে দেখছে আড়চোখে। পাড়ার বউ-ঝিদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলেও তারা নিজে থেকে কথা বলে না।

বীথি তবু রাস্তায় বেরোয়। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে করবেই বা কী? বাড়ি থেকে বেরিয়ে, বারোয়ারি দিঘিটার ডান পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে সে ভট্টাচার্যি পাড়া ছাড়িয়ে মাঠের দিকে চলে আসে। এদিকটায় ধান হয় না, উঁচু-নীচু পাথুরে জমি। এদিকে সৌন্দর্যও কিছু নেই, শুধুই অফলা মাঠ, মাঝে মাঝে কয়েকটা বাবলা আর খেজুরগাছ।

সেই মাঠের মধ্য দিয়ে খানিকটা গেলে একটা মজা নদীর খাত। শুধু মজা নয়, একেবারেই মরা। বর্ষার সময় সামান্য একটু জল জমে, অন্য সময় মনে হয় যেন একটা ঢালু রাস্তা। খটখটে শুকনো, ধুলো ওড়ে পর্যন্ত। লোকে বলে, এই নদীটা যখন জীবন্ত ছিল, তখন আশপাশের জমিতে সোনা ফলত। সে কবেকার কথা কে জানে, এখনকার কেউ সেই সুদিন দেখেনি।

বিকেল চারটে সাড়ে-চারটের পর রোদ খানিকটা দুর্বল হয়ে গেলে বীথি এসে বসে এই মরা নদীর খাতে। সে জানে, গ্রামের কোনো মেয়ে এ-রকমভাবে একা একা মাঠের মধ্যে এসে বসে থাকে না। কোনো বউয়ের পক্ষে তো আরও নিন্দের ব্যাপার। এসব জেনেশুনেও বীথি আসে। কোনো একটা সময় তার একটু ফাঁকা জায়গা দরকার, একটু নিরালা।

জায়গাটা পরিষ্কার। উন্মুক্ত বাথরুম ব্যবহার করা যাদের অভ্যেস তারাও এতটা দূরে আসে। নদীর খাতের মধ্যে গিয়ে বসলে মাঠ থেকে আর দেখাও যায় না কিছু। এইখানে রোজই এক-জায়গায় বসে বীথি একটা গর্ত খোঁড়ে।

এটা তো ফল্গু নদী নয় যে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে জল বেরোবে। এটা বীথির একটা খেলা। এক টুকরো মরচেপড়া লোহার ডাণ্ডা দেখতে পেয়ে বীথি প্রথম একদিন এমনিই অন্যমনস্কভাবে খুঁড়তে শুরু করেছিল। এখন সেটা বেশ একটা খেলনা পুকুরের মতন হয়েছে। দু-তিন হাত চওড়া। একসময় মেয়েরা এইরকম পুকুরঘাটে পুণ্যিপুকুরব্রত করত। বীথি কোনোদিন ওসব ব্রত-ট্রত করেনি। কিন্তু নিজের হাতে একটা পুকুর তৈরি করবার ব্যাপারটা তার বেশ ভালো লাগে। এটার চারপাশে সে চারটে বনতুলসী গাছ লাগিয়েছে। এখন রোজ সে এটাকে গভীর করছে। একটু বৃষ্টি হলেই নিশ্চয়ই এটা ভরে যাবে। দু-হাত দিয়ে সে ঝুরো ঝুরো মাটি তোলে।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর এক-একদিন বীথি এখানে বসে কাঁদে।

কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই, সন্ধ্যের পর এদিকে কেউ আসে না, তবু অনেক অদৃশ্য চোখ যেন লক্ষ করে সব। ঠিক খবর রটে যায়। বাজারের চায়ের দোকানে আলোচনা হয়। যথাসময়ে তা দ্বারিকের কানেও পৌঁছোয়।

আপনাদের বাড়ির...উনি..মাঠের মধ্যে বসে কাঁদছিলেন...বোধ হয় শরীরটা এখনও সারেনি।

দ্বারিক অসহিষ্ণুভাবে সোমেশ্বরকে জিজ্ঞেস করে, তুই নিজে শুনেছিস? তুই সন্ধ্যেবেলা ওখানে কী করছিলি?

সোমেশ্বর বলে, আমি নিজে শুনিনি ঠিকই...কিন্তু অনেকেই বলাবলি করছে...

অনেকে তো অনেক কিছু নিয়েই বলাবলি করে, সব সত্যি?

আপনি চটে যাচ্ছেন কেন, দ্বারিকদা? আমি বলছিলাম, ওনার হয়তো পেটে ব্যথা-ট্যথা হয়, মুখ ফুটে বলেন না, উনি এত চাপা স্বভাবের...

প্রথম প্রথম সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পর দ্বারিক ব্যস্তভাবে টর্চ নিয়ে দু-একদিন খুঁজতে গিয়েছিল বীথিকে। বীথি নিষেধ করেছে।

আপনি আমার জন্য ভয় পাচ্ছেন কেন? এখানে তো রাস্তা হারাবার কোনো ব্যাপার নেই।

তা নেই, তবু এত অন্ধকারে...হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে...

যদি দু-একবার পড়েও যাই, আমি তো ননির পুতুল নই!

তবু, তোমার এ-রকম গ্রামের রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস নেই অন্ধকারে।

এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

দ্বারিক তখন হেসে বলেছিল, তা না হয় অভ্যেস হয়ে গেছে বুঝলাম, কিন্তু সাপ-টাপের সামনে যদি পড়ো হঠাৎ?

আমি একা বেরোলে মা কি রাগ করেন?

না, না, সেজন্য নয়। তুমি একা বেরোবে না কেন...

বীথি তারপরেও রোজ যায়। দ্বারিক মনে মনে যথেষ্ট অস্থির হয়ে থাকে বীথি না-ফেরা পর্যন্ত, কিন্তু আর টর্চ নিয়ে খুঁজতে আসে না। সে চায় না বীথির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে। মা কিছু বলতে এলে সে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

সবাই কি তোমাদের মতন ঘরকুনো হয়ে থাকবে নাকি? বিকেল বেলা তো বেড়াতে যাওয়া ভালোই!

তবু পদ্ম যদি অন্তত সঙ্গে যেত!

পদ্ম সরকারদের বাড়ির মেয়ে। বারো-তেরো বছর বয়েস। প্রায়ই এ বাড়িতে এসে বসে থাকে। খুবই বোকা মেয়েটা। বীথি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই তাকে সঙ্গে নেয় না!

পদ্ম তো বকবক করে কানের পোকা বার করে দেয়। সেইজন্যই নিশ্চয়ই সঙ্গে নেয় না পদ্মকে।

এর পর মা তাঁর অভিমানের অবধারিত বাক্যটি বললেন।

তোরাই সব বুঝিস! তোরাই সব জানিস!

মল্লিকপুরে বাস থেকে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বীথি এসেছিল একদিন। মাকে প্রণাম করে বলেছিল, আমি এখানে থাকতে এসেছি। আমি স্বদেশের স্ত্রী।

মা আকাশ থেকে পড়েছিলেন। স্বদেশ? স্বদেশ কে?

ভাগ্যিস দ্বারিক বাড়ি ছিল সেই সময়। নইলে ভুল বোঝাবুঝির পর্ব আরও অনেক দূর গড়াত।

তার মাত্র একমাস আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দ্বারিক ফিরেছে। যুদ্ধে আহত সেনানীর মতন ক্ষতস্থান শুকোচ্ছিল সে তখন। একটু সুস্থ হলে আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার সংকল্প ছিল।

দ্বারিক তাড়াতাড়ি বলেছিল, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে মাকে বলেছিল, স্বদেশ হচ্ছে আমাদের ভুতো।

ভুবন হালদার ছেলে-মেয়েদের নাম রেখেছেন খুবই পুরোনো ধরনের। দ্বারিকের ছোটোভাইয়ের নাম অম্বিকা। ডাকনাম ভুতো। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর ভুতো তার দুটো নামকেই অপছন্দ করত খুব। আত্মগোপন করে থাকবার সময় সে নিজেই ছদ্মনাম নিয়েছিল স্বদেশ। সেই নামেই পুলিশ, খবরের কাগজ ও বন্ধুবান্ধবরা অনেকে তাকে চেনে।

একে একে ভুলোর ইউনিটের প্রায় সকলেই ধরা পড়েছে বা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু ও বার বার পুলিশের ফাঁদ ডিঙিয়ে পালিয়ে গেছে। জেলে বসে দ্বারিক অনেকবার বাইরে খবর পাঠিয়েছিল, ভুতো শুধু শুধু দুঃসাহসিকতা না দেখিয়ে, যেন প্রকাশ্যে, খবরের কাগজের লোকদের জানিয়ে ধরা দেয়। জেলটাই তখন তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, কারণ তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তখন অনেকেই ব্যস্ত। তবু ধরা দেয়নি ভুতো।

স্বদেশের সঙ্গে আপনার কোথায় পরিচয়?

বহরমপুরে, একসময় কয়েক মাস আমাদের বাড়িতে ছিল।

এ খবরও সঠিক। দ্বারিক যথা সময়ে খবর পেয়েছিল, ভুতো বহরমপুরে লুকিয়ে আছে। ওদিকে তাদের বেশ শক্ত ঘাঁটি ছিল।

আপনার বাবা উকিল?

হ্যাঁ ছিলেন।

উনি–

মারা গেছেন।

মানে, ওঁকে কি...

না, সেসব কিছু নয়। হার্ট স্ট্রোক।

দ্বারিক যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ভুতোকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সেই উকিল ভদ্রলোক খুন হতেও পারতেন। পার্টির ছেলেদের মুখে দ্বারিক শুনেছে, ভদ্রলোক খুব উৎসাহী আর তেজস্বী ছিলেন। ওকালতির দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না, সমাজসেবা করতেন।

কতদিন আগে?

এই তিন মাস।

মা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তখনও। চোখ দুটো যেন কপালে উঠে গেছে।

কী বলছিস তোরা? ভুতো বিয়ে করেছে? কবে? আমরা কিছু জানলাম না?

দ্বারিক বুঝতে পারছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে তার কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার মায়ের আড়ালে। সব কথা মায়ের সামনে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাকে এখন চলে যেতে বলাও অসম্ভব। মা একটা সাংঘাতিক খবর শুনেছেন।

সেসময় আপনার বাবা বেঁচেছিলেন?

আমাদের বিয়ের সময়? হ্যাঁ...উনি কলকাতা থেকে ওঁর এক বন্ধু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বহরমপুরে...বাবা অবশ্য গোড়ায় একটু আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন এখনই বিয়ের দরকার নেই, আরও কিছুদিন বাদে, কিন্তু আমরা দুজনেই বলেছিলাম...বিশেষত স্বদেশ।

দ্বারিকের বুকের মধ্যে এমন শব্দ হচ্ছিল যেন বাইরের সবাই শুনতে পাবে। সে বীথির মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। ভুতোর বিয়ের খুব ক্ষীণ একটা গুজব সে শুনেছিল, সে সেটাকে গুজব বলেই ধরে নিয়েছিল।

মা জিজ্ঞেস করলেন, ভুতো আমাদের কিছু জানালো না?

সেসময় আপনাদের কাছে চিঠি পাঠানো ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কেন একখানা পোস্টকার্ডও লিখতে পারেনি?

মায়ের গলায় ঝাঁঝ টের পেয়ে দ্বারিক বলেছিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ মা আজ, যখন-তখন আমাদের বাড়ি সার্চ হত...ভুতোর চিঠি পেলে হয়তো তোমাদেরও ধরে নিয়ে যেত থানায়।

তখন না হয় দেয়নি, কিন্তু তারপর এতগুলো দিন কেটে গেল।

চুপ!

কথাবার্তা তক্ষুনি বন্ধ করে দিতে হয়। বাইরে কারা যেন এসেছে।

এসেছিলেন বলাইকাকা। উনি এসেছিলেন গ্রামের নিন্দাকাতর বা অতি-কৌতুহলীদের প্রতিনিধি হয়ে। একটি অচেনা মেয়ে একলা একলা এসেছে দ্বারিকদের বাড়িতে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গল্প আছে। সে-গল্পটা তক্ষুনি তক্ষুনি না জানলে নয়।

দ্বারিক বলেছিল, মা, এঁকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি বলাইকাকাদের সঙ্গে কথা বলছি।

কারোকে পছন্দ না করলেও মুখের ওপর সে-কথা বলা যায় না। দ্বারিক একথাও বলতে পারেনি যে, বলাইকাকা, আমরা এখন খুব ব্যস্ত আছি, আপনি এখন চলে যান।

বলাইকাকা দ্বারিকের ঘরে বসে কথা তুলেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে।

তোমার সঙ্গে তো সত্যকিঙ্কর সেনের খুব খাতির। ওঁকে বলে আমাদের এই মোরামডাঙায় একটা ডিপটিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করে দাও এবার! গাঁয়ের লোক তোমার ওপর ভরসা করে আছে।

আমার সঙ্গে সত্যকিঙ্কর সেনের খাতির আছে?

এখন তো সব মিটমাট হয়ে গেছে তোমাদের মধ্যে!

কীসের মিটমাট?

আহা, তোমরা তো একসময় এক পার্টিরই লোক ছিলে! তুমি একটা অনুরোধ করলে সে কথা কি ফেলতে পারবে?

সত্যকিঙ্কর সেন স্থানীয় এম এল এ। একসময় দ্বারিক ওঁদের পার্টির কর্মী ছিল ঠিকই। সত্যকিঙ্কর সেনের কাছেই দ্বারিকের রাজনীতির দীক্ষা। কিন্তু তারপর এতদিনে দু-জনের পথ সম্পূর্ণ দু-দিকে চলে গেছে। হঠাৎ দেখা হলে সত্যকিঙ্করবাবু দ্বারিককে দেখে নিশ্চয়ই মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। সত্যকিঙ্করবাবুরা একসময় দ্বারিকদেরই সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে মনে করতেন। দ্বারিকের দলের অনেক ছেলেরা এখনও নিজেদের বাড়িতে যে ফিরতে পারছে না, তার কারণ সত্যকিঙ্করবাবুর দলের ছেলেরা এখানে বদলা নেওয়ার কথা বলে। দ্বারিককেও তারা এখনও ছেড়ে দেবে কিনা তার ঠিক নেই। দ্বারিক ওদের এড়িয়ে চলে পারতপক্ষে। এসব কথা বলাইকাকাকে বলে লাভ নেই।

এ-রকম অনুরোধ আমি করতে যাবই-বা কেন?

আমাদের গাঁয়ে ডিপটিউবওয়েলের দরকার নেই? রণকালীপুরে পর্যন্ত হয়েছে একটা।

দ্বারিক বুঝতে পেরেছিল, বলাইকাকা আলগা আলগাভাবে কথা বলছিলেন মাত্র, আসলে কান খাড়া করে ছিলেন বাড়ির ভেতরের কথাবার্তা শোনবার জন্য।

আপনারা ব্লক অফিসে দরখাস্ত পাঠান।

ওসব দরখাস্ত অনেকবার দেওয়া হয়েছে...ভেতর থেকে তদবির না করলে..কংগ্রেসই বল আর বামপন্থীই বল, যে সরকারই হোক...

বিদায় নেওয়ার সময় বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বলাইকাকা আসল কথাটি বলে দিলেন।

তোমাদের বাড়িতে একটি মেয়ে এসেছে কলকাতা থেকে..রাস্তায় লোককে এবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিল।

হ্যাঁ। এসেছে, একটি মেয়ে।

আগে দেখিনি কখনো।

একটু আগে বলাইকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দ্বারিক দু-তিনরকম কৈফিয়ত বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। একটা বাজে লোকের কাছে সে কেন অকারণে মিথ্যেকথা বলবে?

ওই মেয়েটি আমাদের ভুতোর বউ!

শাঁখ বাজল না, গ্রামের মেয়েরা উলু দিল না, অথচ গ্রামে একজন নববধূ এল। এটা লোকের জিভের খোরাক হিসেবে চলেছিল বেশ কিছুদিন।

দ্বারিক আর বেশি জেরা করেনি বীথিকে। বরং বীথির পক্ষ নিয়ে সে মাকে, বাবাকে বোঝাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিল। যদিও ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। হুট করে এ রকমভাবে কেউ আসে না। আগে থেকে একটা খবর দিল না। সঙ্গে অন্য কেউ এল না, এতে সন্দেহ তো হবেই। এমনকী পুলিশের স্পাই হওয়াও বিচিত্র ছিল না। পুলিশ এ-রকম অনেক অদ্ভুত কাজও করেছে।

কিন্তু সত্যের একটা আলাদা ধ্বনি আছে। যা শুনলেই বোঝা যায়। বীথি নিরুপায় হয়েই এসেছিল।

বীথি তখন ছ-মাসের গর্ভবতী।

বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় বীথিরা বেশ অসুবিধেয় পড়েছিল। তার দাদা আজও জেলে। মা অনেক দিনের পুরোনো হাঁপানি রুগি। বাড়িতে বীথির আর একটি ছোটোবোনের বয়েস মাত্র তেরো, এইরকম অবস্থায় ওদের ফেলে হঠাৎ পৃথিবী থেকে প্রস্থান করলেন ওর বাবা।

বীথির কাছে ভুতোর লেখা এগারোখানা চিঠি আছে। সেগুলো দ্বারিককে পড়তে দিতে চেয়েছিল বীথি, দ্বারিক রাজি হয়নি। ম্যারেজ সার্টিফিকেটও বীথি সঙ্গে করে এনেছিল অবশ্য। কিন্তু সেটা তো আর হাতে করে নিয়ে গ্রামের সব লোককে ঘুরিয়ে দেখানো যায় না। তাই, বাড়িতে আর একটা ছোটোখাটো উৎসব করার জন্য মায়ের প্রস্তাবে রাজি হতে হয়েছিল দ্বারিককে। এমনকী একজন অশিক্ষিত পুরুত এসে কিছু মন্ত্রও পড়ে দিয়ে গেল পর্যন্ত। যে অনুষ্ঠানে স্বামী অনুপস্থিত, সেখানেও বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করার মতন আলাদা মন্ত্র থাকতে পারে?

মা অবশ্য বীথিকে মেনে নিতে খুব বেশি দেরি করেননি। দু-দিকেই আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। বীথিকে দেখে মায়ের আশা হয়েছিল, এবার শিগগিরই নিশ্চয়ই ভুতো ফিরবে! ভুতো যাতে খুশি হয় সেইজন্য মা বেশি বেশি আদর-যত্ন করতে লাগলেন বীথিকে।

বাবাকে বিশেষ কিছু বোঝাতে হয়নি। দুই ছেলে আত্মগোপন করে থাকবার সময় পুলিশ যখন-তখন এসে ভুবন হালদারকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। ভুবন হালদার নিরীহ মানুষ, সেই ধরনের মানুষ, যাদের কোনো পুলিশের সঙ্গে সারাজীবনে একবারও দেখা হওয়ার কথা নয়। পুলিশের নানান কৌশলের জেরা ও অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না ভুবন। মাথার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। এখন সবাই তাঁকে একটি আধপাগলা বুড়ো হিসেবে ধরে নিয়েছে। বীথিকে দেখে ভুবন হালদার কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না। তবে, এক-এক সময় তিনি বীথিকে দ্বারিকের বউ বলে ভুল করে ফেলেন আর মার কাছে বকুনি খান।

দুই ছেলের মধ্যে মা ভুতোকেই বেশি ভালোবাসেন। কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি মায়ের বেশি টান থাকা স্বাভাবিক। দ্বারিক এটা বোঝে। তা ছাড়া ভুতোর চরিত্র অনেক বেশি ঝলমলে, সে

জোরে কথা বলে, চিৎকার করে হাসে, পায়ে দড়ি না বেঁধেও সে নারকেল গাছ চড়েছে, সে এক ডুব দিয়ে অন্তত পাঁচ-সাত মিনিট পুকুরের জলের তলায় থাকতে পারে। এ ছাড়া,

ভুতো ন্যাশনাল স্কলার হয়েছিল। শুধু এ গ্রামে নয়, এই মহকুমায় সে-ই প্রথম। সে তুলনায় দ্বারিকের অনেক ঠাণ্ডা মাথা, সে অচঞ্চল। মা ভরসা করেন দ্বারিকের ওপর, কিন্তু ভালোবাসেন বেশি ভুতোকে।

দ্বারিকও মাকে বুঝিয়েছিল, এবার ভুতো ফিরে আসবে শিগগিরই।

ডিপটিউবওয়েলের দাবির দরখাস্ত নিয়ে গ্রামের লোক দল বেঁধে গিয়েছিল এম এল এ-র কাছে। প্রতিবেশীদের পীড়াপীড়িতে যেতে হয়েছিল দ্বারিককেও।

সত্যকিঙ্কর যেন বিস্ময়কর ব্যবহার করেছিলেন দ্বারিকের সঙ্গে। একসময় উনি দ্বারিককে তুই বলতেন, সেদিন তুমি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এসো, এসো দ্বারিক। আমি নিজেই ভাবছিলাম একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তুমি নাকি একটা স্কুলে পড়াচ্ছ এখন?

দ্বারিক বলেছিল, বাবা যে স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন, সেখানেই আমি কিছুদিনের জন্য স্টপ গ্যাপ।

কেন, স্টপ গ্যাপ কেন?

গভর্নমেন্ট এইডেড স্কুল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে রেগুলার ওয়েতে লোক নিতে হয়।

তুমি লোকাল ছেলে, তোমারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। তা ছাড়া তুমি ছাত্র হিসেবেও ভালো ছিলে...ওটা রেগুলার করে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না মনে হয়।

এই কথা বলে সত্যকিঙ্কর সেন কি একটু সূক্ষ্মভাবে হেসেছিলেন? দ্বারিক বোঝার চেষ্টা করছিল, উনি বিদ্রুপ করছেন কিনা। উনি কী বলতে চাইছেন, খুব তত বিপ্লবীপনা দেখিয়ে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছিলি, এবার স্কুল মাস্টারি নিয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে থাক। তোরাই-না স্কুল-কলেজ পুড়িয়েছিস? তোরাই-না বলেছিলি, স্কুল-কলেজে যে-শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সবই ভুয়ো!

কিন্তু কোনো ব্যঙ্গের আভাস দ্বারিকের চোখে পড়েনি। বরং উনি তো দ্বারিককে কিছু সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবেই উদগ্রীব। ভাবখানা এই, পুরোনো শত্রুতা ভুলে গিয়ে এসো, আমরা পাশাপাশি কাজ করি। দ্বারিক তৈরি হয়েছিল, উনি কোনোরকম বাঁকা কথা বললেই সে উত্তর দেবে, বিপ্লবের পথ ছেড়ে আপনারাও তো এখন...বিপ্লবের কথা উচ্চারণ করতেই লজ্জা পান।

শরীর ঠিক আছে তোমার, দ্বারিক? বড্ড রোগা দেখাচ্ছে। অবশ্য আমি অনেকদিন পর দেখলাম।

হ্যাঁ, আমার শরীর ঠিক আছে।

ডিপটিউবওয়েল বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। আলোচনা অনেকখানি সন্তোষজনক। আগামী বাজেটে আড়াইশো ডিপটিউবওয়েল খোঁড়ার ব্যবস্থা থাকছে, তার মধ্যে একটি মোরামডাঙায়।

গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্যে সত্যকিঙ্কর বললেন, আপনারা একটু বসুন, দ্বারিকের সঙ্গে আমার আলাদা একটা কথা আছে। দ্বারিক একটু পাশের ঘরে আসবে?

এই এলাকার অবিসংবাদী নেতা সত্যকিঙ্কর সেন এখন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। বিয়ে করেননি। ছোটো দোতলা বাড়িতে দাদার সংসারে অতিথির মতন থাকেন। মাটি ও মানুষের সঙ্গে কিছুটা যোগ আছে। শোনা যায়, উনি ইচ্ছে করলেই মন্ত্রী হতে পারতেন, এবং ইচ্ছে করেই হননি।

অম্বিকার খবর কী?

দ্বারিক জানত, সত্যদা এইকথাই জিজ্ঞেস করবেন। অম্বিকা অর্থাৎ ভুতো একদিন ওঁদের মধ্যে সত্যিই সন্ত্রাস জাগিয়েছিল। ভুতো দুঃসাহসী, ভুতো হঠকারী। সত্যদা দ্বারিককে ভালোভাবে চেনেন, প্রায় নিজের হাতেগড়া কর্মী, কিন্তু ভুতো প্রথম থেকেই উগ্রপন্থী।

দ্বারিকের মতন ছেলেরা নীতি নির্ধারণ করে। আজকের নীতি কালকে বদলায়। কিন্তু ভুতোর মতন ছেলেরা যখন যা বিশ্বাস করে, তক্ষুনি সেটা কাজে পরিণত করতে নেমে পড়ে। একটা ঘটনা ঘটে গেলে, সেটা আর পালটানো যায় না।

অনেকদিন কোনো খবর পাইনি!

এখন তো আর তার পালিয়ে থাকার কোনো দরকার নেই। সে তো এখন অনায়াসেই ফিরে এসে...

অনায়াসে ফিরতে পারে? আপনি বলছেন?

কেন ফিরতে পারবে না?

জেল থেকে অনেকেই ছাড়া পেয়েছে বা পাবে, কিন্তু যাদের নামে ওয়ারেন্ট ছিল, সেগুলো তো তুলে নেওয়া হয়নি এখনও।

ওটা একটা ফর্মালিটি মাত্র...তুমি তো জান, পুলিশ অনেকের নামেই ক্রিমিনাল চার্জ দিয়েছিল...বাছাই না-করে তো সমস্ত ক্রিমিনাল চার্জ একসঙ্গে তুলে নেওয়া যায় না, তুমিই বলো, যায়? কিন্তু পলিটিক্যাল প্রিজনারদের ক্ষেত্রে...

অর্থাৎ ছাড়া পেতে গেলে ভুতোকে আগে প্রিজনার হতে হবে? সেটাই বোধ হয় সে চায়নি। তা ছাড়া..

ওয়ারেন্ট থাকলেও বোধ হয় অম্বিকাকে পুলিশ এখনও ধরবে না, সে বাড়ি ফিরলে পুলিশ বড়োজোর তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেই চলে আসবে...অন্তত ভয় পাওয়ার মতন যে কিছু নেই, তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

দ্বারিকও একথা জোর দিয়ে বলতে পারে। যে ভুতো আগেও কোনোদিন ভয় পায়নি, সুতরাং তার ভয় পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একেবারে ভয় না পাওয়াটাই ভুতোর

চরিত্রের প্রধান দোষ। বুদ্ধিমান পরিশীলিত স্বভাবের মানুষমাত্রই কিছু-না-কিছুকে ভয় পায়।

শুনলাম সে বিয়ে করেছে। তুমি বড়োভাই, তোমার বিয়ে হল না, তার আগেই অম্বিকা বিয়ে করে ফেলল?

সত্যদা সব খবর রাখেন, অর্থাৎ তাঁর দলের ছেলেরা এখনও ভুতোর ব্যাপারে রীতিমতন সজাগ। দ্বারিকের এই চিন্তাটা বুঝে ফেলেই যেন সত্যদা সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললেন, তোমাকে আরও একটা কথা আমি জানিয়ে দিতে চাই, আমার দলের ছেলেরা অম্বিকাকে একদমই ঘাঁটাবে না। এ বিষয়ে তোমার মনে কোনোরকম সন্দেহ রেখো না। জানিয়ে দিতে পার।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই অনেকদিন।

যাই হোক, তবু আমি জানিয়ে দিলাম। যে সত্যিকারের কাজ করতে চায়, তার পক্ষে লুকিয়ে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে কি কোনো কাজ করা এখন সম্ভব? তার তো কিছু দরকারও নেই? আমি তোমাকে-।

সত্যকিঙ্কর হঠাৎ থেমে গেলেন। ওঁর গলাটা কি একবার হঠাৎ কেঁপে উঠল? দ্বারিকের মনে হল, সত্যকিঙ্কর যেন হঠাৎ টেবিলের ওপরে থেকে ঝুকে হাত বাড়িয়ে দ্বারিকের কাঁধ ছুঁয়ে বলবেন, দ্বারিক, তোকে আমি কত ভালোবাসতাম! তুই আমার নিজের হাতেগড়া, তোর বি এস সি পরীক্ষার আগে আমি নিজে তোকে পড়িয়েছি, আর আজ আমরা পরস্পরের শত্রু? কেন? আমাদের বিশ্বাস তো একই। লক্ষ্যও এক। আয় আমরা আবার হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি, সামনে কত কাজ রয়েছে।

কিন্তু সত্যকিঙ্কর এসব কিছুই বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। দ্বারিক আবার ভাবল, কেনই-বা সত্যদা ওভাবে কথা বলবেন তার সঙ্গে। সে একসময় ওঁকে সত্যদা বলে ডাকত। আজ সে একবারও সেরকমভাবে সম্বোধন করেনি। অবশ্য, সত্যকিঙ্করবাবু বলে

ডাকটাও তার মুখে আসছে না ঠিক। তাই সে কোনোরকম সম্বোধনই করেনি এ পর্যন্ত। সেটা কি সত্যকিঙ্কর লক্ষ করেননি?

দ্বারিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে আজ–

সত্যকিঙ্কর বললেন, অম্বিকা সম্পর্কে আমি আরও একটা খবর শুনেছিলাম–

কী?

না, থাক। সেটা হয়তো নিছক উড়োকথা, কোনো কনফার্মেশন নেই, সেসব নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো।

দ্বারিক আর কোনোরকম কৌতূহল দেখালো না।

পরে, গ্রামে ফেরার পথে আকস্মিকভাবে জল এসে গেল তার চোখে। তার এই দুর্বলতায় নিজে সে অবাক হয়ে গেল দারুণভাবে। এটা ঠিক কান্না নয়। কান্না ছাড়াও অন্য একরকমের চোখের জল আছে।

যাতে কেউ দেখতে বা বুঝতে না পারে, তাই দ্বারিক একটা সিগারেট ধরালো মুখ নীচু করে।

বীথি কেন এসেছিল, তা দ্বারিক বুঝতে পারে। কিন্তু বীথি থেকে গেল কেন, তার কারণটা আজও দ্বারিকের কাছে দুর্বোধ্য লাগে। এ গ্রামের নিস্তরঙ্গ বিস্বাদ জীবন কী করে ভালো লাগতে পারে বীথির? এক-এক সময় তো দ্বারিকেরই অসহ্য লাগে আজকাল, অথচ তার জন্ম এখানে, সে এই সব কিছুর মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে, সব কিছু তার চেনা। বীথি তো শহরের বাইরে কখনো থাকেনি। রোমান্টিক গ্রাম-বিলাস নিয়ে যারা আসে, তাদেরও দু-দশ দিন মাত্র ভালো লাগতে পারে, মাসের পর মাস সেই ভালো লাগা তো টেকে না।

এখানে আসবার মাস দু-এক পরই বীথি প্রথমবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় উঠোনে।

এ গ্রামে হেলথ সেন্টার নেই, কোনো ডাক্তারও নেই। মল্লিকপুর থেকে ধ্যানেশ ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল দ্বারিক। তিনি এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এনার কি আগেও ফিট হয়েছিল কখনো?

ধরনটা এপিলেপসিরই মতন। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। মুখটা ব্যথায় নীল। মা কালোজিরে পুড়িয়ে গন্ধ শুকিয়েছিলেন, কোনো লাভ হয়নি।

পরে খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর বীথি বলেছিল, না আগে তার কখনো এ রোগ ছিল না।

ধ্যানেশ ডাক্তার খানিকটা দার্শনিক ধরনের। পুরোনো আমলের এল এম এফ মুখ ভরতি পাকা দাড়ি। তিনি দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে কথা বলেন। তিনি বললেন, গ্রামের মেয়েদের বাড়ির আঁতুড়ঘরেই বাচ্চা-কাচ্চা হয়, ঠিকঠাক হয়ে যায়। শহরের মেয়েদের জন্য লাগে নার্সিং হোম, হাসপাতাল। যারা সিমেন্টের মেঝেতে সর্বক্ষণ পা দিয়ে হাঁটে, ফ্যানের তলায় যাদের শোওয়া অভ্যেস, তাদের জন্য লাগে সিমেন্টের আঁতুড়ঘর, তাদের পেটের ছানাটার জন্যও ফ্যানের হাওয়ার দরকার। প্রকৃতির এই নিয়ম, বুঝলে? বউমাকে তুমি এ সময়টায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

বীথি যেতে রাজি হয়নি। সে বলেছিল, ও ঠিক হয়ে যাবে।

মা বলেছিলেন, বউমার মায়ের শরীর ভালো না, সেখানে গেলে বউমাকে কে দেখাশুনো করবে এখন। এখানে তবু আমি আছি–

দ্বারিক বুঝতে পেরেছিল যে একটা কিছু ভুল হচ্ছে। কিন্তু জোর করে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

নিজের জন্মের দিনটার কথা তো কারুর মনে থাকতে পারে না। কিন্তু ভুতো যেদিন জন্মেছিল দ্বারিকের মনে আছে, সে-দিনটার কথা। তাদের বাড়ির উঠোনে দরমার বেড়া

দিয়ে বানানো হয়েছিল আঁতুড়ঘর। মা ছিলেন সেখানে। সারাদিন ধরে তুমুল বৃষ্টি, দিনের বেলাতেই চারদিক অন্ধকার। দ্বারিকের তখন বছর ছয়েক বয়েস, আর তার দিদির বয়েস এগারো। দিদিই রান্না-বান্না করছিল ক-দিন, তারপর বাসন্তীনগর থেকে এসেছিলেন এক পিসিমা। মা একটু উঃ আঃ করলেই বাবা দ্বারিককে বলতেন, যা, শিগগির কাদুকে ডেকে নিয়ে আয়। দ্বারিক অমনি ছুটে চলে যেত কুমোরপাড়ায়। কাদু এ তল্লাটের ডাকসাইটে দাই। সে এসেই গজগজ করত, তোমাদের বলিছি যে অমাবস্যার আগে কিছু হবেনি! তবু এত তরাস!

সেই বৃষ্টির দিনে, মাঝরাতে আঁতুড়ঘর থেকে ভেসে এসেছিল ওঁয়া ওঁয়া কান্না। কাদুই নাম রেখেছিল ভুতো। বাচ্চাকে গরম সেঁক দিতে দিতে সে বলেছিল, ঘোর অমাবস্যার রাতে এল বাপ আমার! ভুতোবাবু! ভুতোনাথ। ভুতোগোবিন্দ। বেঁচে থাকো, রাজা হও!

দ্বারিকের স্পষ্ট মনে আছে সব।

কিন্তু এখন ওই উঠোনেই আবার দরমার বেড়া দিয়ে আঁতুড়ঘর বানিয়ে সেখানে ভুতোর সন্তান জন্মাবে, এটা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারে না। ধ্যানেশ ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, তার মনে হয়।

বীথির আত্মীয়স্বজনের দিক থেকে একবার মাত্র এক মামা ও বীথির ছোটোবোন এসেছিল দু-দিনের জন্য। দ্বারিক তখন সামান্য আভাস দিয়েছিল, বীথি যদি ওদের সঙ্গে গিয়ে কিছুদিনের জন্য তার বাপের বাড়িতে থেকে আসে। বীথি রাজি হয়নি।

বীথি দ্বিতীয়বার অজ্ঞান হল পুকুরঘাটে, সন্ধ্যে বেলা। ভাগ্যিস মা সঙ্গে ছিলেন আজ। যদি বীথি একলা থাকত, তাহলে হয়তো গড়িয়ে পড়ে যেতে পারত জলে। কিংবা একা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত, অনেকক্ষণ কেউ জানতেও পারত না।

বীথির পা পিছলে যায়নি, এমনিই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ঝুপ করে বসে পড়ে হঠাৎ তারপর মাটিতে গড়াতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল তার পেটে, যন্ত্রণার চোটে সে তার ডান বাহু কামড়ে ধরেছিল।

মা বুঝেছিলেন, ওটা প্রসব ব্যথা নয়, অন্য কোনো ব্যথা।

গ্রামে কোনো কিছুই গোপন থাকে না, বীথির অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার খবরও গোপন থাকেনি। অমনি কিছু লোক এর মধ্যে একটা ভূতের গল্প চালাবার চেষ্টা করল। বীথির গায়ে নিশ্চয়ই ভূতের ছোঁয়া লেগেছে। একটা জারুলগাছের ভাঙা ডাল পড়েছিল পুকুরপাড়ে। সেটা নাকি আপনা আপনি নীচু হয়ে ঝাপটা মেরেছিল বীথির মাথায়।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ই হঠাৎ আশিস আর মলয় বেড়াতে এসেছিল এই গ্রামে। ভারি চমৎকার ছেলে দুটো, ওরা ভুতোর বন্ধু। ওদের মধ্যে আশিস সদ্য ডাক্তারি পাস করে দুর্গাপুরে একটা হাসপাতালে কাজ নিয়েছে।

দেখা গেল, ওরা বীথিকে আগে থেকেই চেনে। তুমি তুমি বলে কথা বলে। মলয় নাকি ভুতোর বিয়ের দিন উপস্থিত ছিল বহরমপুরে। ওদের পেয়ে দ্বারিক খুবই খুশি হল। বীথিকে নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিল সে। বীথির সঙ্গে সব কথা সে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে না। গ্রাম্য সংস্কারের ছোঁয়াচ থেকে বীথিকে মুক্ত রাখবার জন্য সে বদ্ধপরিকর অথচ প্রায়ই খানিকটা অসহায় বোধ করে। আশিস আর মলয় ভুলোর বন্ধু, ওরা বন্ধুর স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারবে। তার ওপর আশিস আবার নিজেই ডাক্তার।

ছেলে দু-টির আর সবই ভালো, খুব সুন্দর স্বভাব, কিন্তু একটা শুধু অদ্ভুত ব্যাপার, ওরা ভুতোর সম্পর্কে খুব কম কথা বলে। প্রসঙ্গটা উঠলেই হুঁ হাঁ করে এড়িয়ে যায়। মা ওদের কাছে অন্তত হাজার বার ভুতোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন, ওরা হেসে বলেছে, আপনি অত চিন্তা করছেন কেন মাসিমা? ঠিক এসে যাবে! এখনও সময় হয়নি।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমাদের সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে ভূতোর, ঠিক করে বলো তো!

আশিস মলয়ের দিকে ফিরে বলেছিল, তোর সঙ্গে মাস খানেক আগেই দেখা হয়েছিল না?

মলয় বলেছিল, তারও কম, পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন আগে।

তাহলে কেন সে একবার এখানে আসে না?

আশিস বলেছিল, অনেকগুলো স্টেট থেকে মামলা ঝুলিয়েছে তো ওর নামে, শুধু আমাদের এখানে ছেড়ে দিলেই তো হবে না–

কেন চিঠি লেখে না আমাদের। আর তো পুলিশ আসে না।

আচ্ছা ওকে খবর পাঠিয়ে দেব, যাতে আপনাকে চিঠি লেখে খুব শিগগির।

বীথিকে আশিস হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার গায়ে নাকি পেতনির বাতাস লেগেছে?

বীথি উত্তর দিয়েছিল, হতেও পারে।

মলয় বলেছিল, পেতনিরা বোধ হয় টের পায়নি যে তুমি ভুতোর বউ! তাহলে আর তোমাকে ঘাঁটাতে আসত না!

তিনদিন পর ওরা দু-জন ফেরার সময় বীথিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল দুর্গাপুরে। দু-দিন বাদে মলয় বীথিকে আবার পৌঁছে দিয়ে গেল। হাসপাতালে সব পরীক্ষা-টরীক্ষা করে দেখা হয়েছে সবই ঠিকঠাক আছে। অকারণ দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আশিস অনেক ওষুধপত্র ও টনিক পাঠিয়ে দিয়েছে বীথির সঙ্গে।

দিন পনেরো ভালো থাকার পর ফের এক সপ্তাহের মধ্যে দু-বার অজ্ঞান হল বীথি। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে দ্বারিক একটা টেলিগ্রাম পাঠাল আশিসকে। সিমেন্টের আঁতুড়ঘর এবং ফ্যানের হাওয়ার নীচেই সে ভুতোর সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে চায়। ভুতো এখানে উপস্থিত থাকলে সে যা খুশি করতে পারত। দ্বারিক একা দায়িত্ব নিতে পারে না।

দ্বিতীয়বার আশিস আর মলয় এসে থাকল পাঁচদিন। সেই ক-দিন বীথি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও দ্বারিক জোর করতে লাগল, বীথিকে শহরেই নিয়ে যেতে হবে। মা কিংবা বীথির কোনো আপত্তিতেই সে কান দিল না। এবার বীথির সঙ্গে সে নিজেও গেল দুর্গাপুরে। উঠল গিয়ে আশিসের কোয়ার্টারে। সেখানে আশিসের মা থাকেন, সুতরাং কোনো অসুবিধেই নেই।

দশদিন পর বীথি একটি মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করল।

তারপরও দ্বারিক বীথিকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিছুদিন অন্তত সে বহরমপুরে তার মায়ের কাছে গিয়ে থেকে আসতে চায় কিনা। বীথি বলেছিল, না। আমি কাছাকাছি থাকলে মা তবু খানিকটা সান্ত্বনা পাবেন। ওঁর তো কথাবলারও কোনো সঙ্গী নেই।

এখানে মা অর্থে বীথির মা নয়, দ্বারিকের মা।

একটু থেমে বীথি আবার বলেছিল, শেষ চিঠিতে আপনার ভাই আমায় লিখেছিল, তুমি। মোরামডাঙায় আমার মায়ের কাছে থেকো। সেখানেই আমি প্রথমে ফিরব।

সময় থেমে থাকেনি। এরপরও কেটে গেল সাড়ে তিন মাস।

৪. শরিকের আমবাগানে ভুবন

কিন্তু শরিকের আমবাগানে ভুবন গিয়েছিলেন সকাল বেলা। সেখানে একটা কান্ড বাধিয়ে বসলেন।

নামেই আমবাগান, কিন্তু আম বিশেষ ফলে না। যে কটা হয় তাও হাড়ে টক। এদিকে ভালো জাতের আম বিশেষ দেখা যায় না। আগে নাকি ফলত খুব ভালো। এখনকার সবাই পূর্বকালের সুখসমৃদ্ধির কথা খুব বলে। কেউ চোখে দেখেনি, সবই বক্তাদের জন্মের আগেকার কথা।

এখন ওটা আর বাগান নয়, জঙ্গল। আমের চেয়ে অন্য আরও বারো জাতের গাছপালাই বেশি।

তিন শরিকের মধ্যে ভুবনদের কোনো শরিকানা নেই। ছিল অনেক কাল আগে, এখন কিনে নিয়েছে মহাদেব সাহা। তবু ভুবন ওখানে প্রায়ই সকালের দিকে যান আমলকী কুড়োতে।

তিন-চারটি ছেলে সেখানে তাদের নিজস্ব খেলা খেলছিল। ছোটোছেলেদের দেখলেই ভুবন আজকাল একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যান। একটা গাছের ডাল ভেঙে ছপটি বানিয়ে ঠিক বাঁদর তাড়াবার ভঙ্গিতে ভুবন বলতে লাগলেন, এই যা, যা, যা।

ছেলেরা একজন বুড়োলোকের এ-রকম অন্যায় আবদার সহ্য করবে কেন? তারাও ভুবনের পেছনে লাগল। ভুবন ওদের দিকে তেড়ে গেলে দৌড়ে পালায়, আবার চুপি চুপি পেছন থেকে এসে ভুবনের পিঠে খোঁচা মারে।

ভুবন একটি ছেলেকে ছপটির বাড়ি মারতেই অন্য একটি ছেলে ভুবনের ধুতি ধরে টান দিল। ভুবন প্রথমে মুক্তকচ্ছ, তারপর দিগম্বর হয়ে গেলেন। ধুতিখানা নিয়ে মাথার ওপর

ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচাতে লাগলেন, আরে হারামজাদার পাল, আয়, তোদের বাপের জন্ম দেখিয়ে দিচ্ছি! নির্বংশের ব্যাটারা, আয়, আয়–

ছেলেদের চেঁচামেচিতে আরও অনেক ছেলে জুটল। তারপর বড়োরা। সবাই মিলে পাগল খ্যাপাতে লাগল।

দ্বারিক তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। উঠোন থেকে বলাইকাকা চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও দ্বারিক, একবার বাইরে এসো, দেখে যাও তোমার বাপের কীর্তি।

দ্বারিক সবচেয়ে অপছন্দ করে ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসা। সকালে প্রথম চোখ মেলার পর মানুষ খানিকটা আচ্ছন্নভাবে পাখির ডাক শুনবে, নতুন আলো দেখবে, আবার চোখ বুজে, বেঁচে থাকার স্বাদটা সমস্ত শরীরে অনুভব করে ফের আবার চোখ মেলবে। তারপর উঠে বসবে। এটাই তো স্বাভাবিক। পুরুলিয়া জেলে থাকার সময়ও রোজ ভোরে একটা ইষ্টিকুটুম পাখির ডাক শুনে দ্বারিকের ঘুম ভাঙত।

চোখ কচলাতে কচলাতে দ্বারিক বাইরে বেরিয়ে এল।

বলাইকাকা নিম্নস্বরে বললেন, তোমার বাবা আবার পাগলামি শুরু করেছেন। একটা কিছু চিকিৎসা করাও এবার। রণকালীপুরের গাজি সাহেব শুনেছি ভালো ওষুধ দেন।

দ্বারিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বাবাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে আগেই। সেবারে আশিসরা যখন এসেছিল, তখনও ওদের সঙ্গে সে তার বাবার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিল। আশিস কেসটা বলেছিল তার এক মাস্টারমশাইকে। সবাই বলেছেন, এর এমনি কোনো চিকিৎসা নেই। হঠাৎ একদিন ভালো হয়ে যাবে।

ভুবন তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ধুতিটাকে হাতের ছপটির সঙ্গে বাধিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছেন। দেখে কে বলবে যে এই মানুষটি একটানা পঁয়ত্রিশ বছর অঙ্কের মতন একটি দুরূহ বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

বাবা, বাবা! ধুতিটা পরে নিন।

ভুবন একগাল হেসে বললেন, আমি কারুর বাবা নই, বাপ! আমি আমার নিজের বাবার একমাত্র ছেলে! কোনোদিন তাঁর কথার অবাধ্য হইনি!

দ্বারিক জোর করে বাবার হাত থেকে লাঠিটা ছাড়িয়ে নেয়। ভুবন টেনে এক চড় মারেন ছেলের গালে। দ্বারিক সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে কড়া ধমকের সুরে বলে, শিগগির, ধুতিটা পরে নিন।

দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেরা খলখল করে হাসছে।

প্রহসনটি এখানেই শেষ হল না। দ্বারিক তার বাবাকে ধুতিটা পরিয়ে দিতে যেতেই ভুবন তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালালেন। শুরু হল সারাবাগানময় দৌড়োদৌড়ি। ছেলেরা মহাকৌতুকে হাততালি দিচ্ছে, বড়োরাও হাসছে। কেউ দ্বারিককে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল না। একটা মোটা আমগাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ভুবন ঠিক বাচ্চাছেলের মতন বলতে লাগলেন, ধর দেখি! ধর দেখি আমাকে!

বাবাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে দ্বারিক ফিরে যেতে পারে না। উলঙ্গ অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে, বীথি যাই মনে করুক। ধুতিটা মাটিতে ফেলে দু-হাতে সে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

ভুবন ঠাস ঠাস করে তাকে চড় মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলেন, ছাড়! ছাড় হারামজাদা। আমি তোদের কেউ না!

ভুবন? ভুবন!

এক জলদগম্ভীর ধমকে সবাই থমকে ফিরে তাকাল। গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই। টকটকে লাল ধুতি পরা, গায়ে মুগার চাদর, পায়ে খড়ম। হাতে একটা পেতলের ফুলের সাজি। সুদীর্ঘ চেহারার পুরুষ!

যেন সাপের মাথায় লাঠির বাড়ি মারা হল। ভুবন একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে ভীতু গলায় বললেন, গোষ্ঠদা?

ভুবন গোষ্ঠ ভট্টাচার্যকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার বললেন, ঘূবি না! চুবি না আমাকে, বেল্লিক কোথাকার, সকাল বেলা সং সেজেছিস?

ভুবনকে নাম ধরে ডাকার মতন লোক গ্রামে আর বেশি নেই। গোষ্ঠ ভট্টাচার্য শুধু বয়েসের জন্যই নয়, ব্যক্তিত্বেও তিনি এ গ্রামের শিরোমণি। বহুকালের সংস্কারবশে ভুবন এখনও এঁকে ভয় পান।

ধুতিটা পরে নে! লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু আর নেই?

ভুবন সুড়সুড় করে অমনি ধুতিটা জড়িয়ে নিলেন কোমরে। ভুবনের ঠোঁট দুটো কাঁপছে। দ্বারিক বুঝতে পেরেছে, তার বাবা এখন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছেন, মনের গ্লানিতে এখন তিন-চারদিন আর কারোর সঙ্গে কথাই বলবেন না। নিজের ঘরে বসে থাকবেন গোঁজ হয়ে।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যকে দেখেই মজা উপভোগকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ভুবন মাথা হেঁট করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে, দ্বারিকও সঙ্গে যাবে ভেবেছিল, গোষ্ঠ ভট্টাচার্য তাকে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

তোর শরীর কেমন আছে এখন?

ভালোই আছে, জ্যাঠামশাই।

রাত্তিরে কাশির জন্য খুব কষ্ট পাস শুনেছি?

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের নিজস্ব কোনো গোয়েন্দাবাহিনী আছে কিনা কে জানে, কিন্তু তিনি আশে পাশের তিন-চারখানা গ্রামের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ঘটনার খবর রাখেন।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খুব বাড়ে, আবার একটু কমে।

কী ওষুধ খেয়েছিস?

এক্সপেকটোরান্ট। মাঝে মাঝেই দু-এক শিশি।

ওগুলো ওষুধ নয়, বিষ। আয় আমার সঙ্গে, আমি তোকে ওষুধ দেব, একেবারে সেরে যাবে।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের কথার প্রতিবাদ করার কোনো প্রথা নেই এ গ্রামে। ওষুধের ব্যাপারে তিনি একজন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, একথা দ্বারিক ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। তবে, ইনি নিয়মিত রুগি দেখেন না, ওষুধও দেন না। যখন যাঁর ওপর দয়া হয়, তখন ওষুধ দেন তাঁকে। সেসব ওষুধই দৈব প্রদত্ত। গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ওষুধ পাওয়া রীতিমতন ভাগ্যের কথা।

দ্বারিক এই বিশিষ্ট দয়া প্রত্যাখ্যান করবে কিনা, তা নিয়ে দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর ভাবল, দেখাই যাক-না গিয়ে। সে একটু দূরত্ব রেখে গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। বাসি জামাকাপড় পরে কোনোক্রমে ওঁকে ছুঁয়ে ফেললেই বিপদ।

ভট্টাচার্যপাড়ায় এঁদের বাড়িটাই সবচেয়ে পুরোনো। পাতলা ইটের বাড়ি। অনেক জায়গা ভেঙে পড়েছে, বট, অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছে ছাদ ফুঁড়ে, তবু এখনও যা অক্ষত আছে, তাও কম নয়। ঠাকুরদালানটি বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার। সিঁড়িগুলো শ্বেতপাথরের।

খড়ম ঠকঠকিয়ে গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই উঠে গেলেন ঠাকুরদালানে। দ্বারিক উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইল। সে মুখ ধোয়নি, বিছানা থেকে সোজা উঠে এসেছে। এই অবস্থায় কোনো জায়গায় বসলে যে অন্যায় বা অপবিত্র ব্যাপার হবে, সে ঠিক জানে না।

উলটোদিকের দালানে বাড়ির অন্য লোকেরা তাকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। বছর পাঁচেক সে জেলে কাটিয়েছে, তার আগেও দু-তিন বছর গ্রামছাড়া হয়েছিল। একসময় তার নামের সঙ্গে একটা ভয় জড়িয়ে ছিল। এখনও অনেকেই তার সঙ্গে সহজভাবে মেশে না। সমীহ করে।

জ্যাঠামশাই, বাড়িতে কিছু বলে আসিনি, আমি না হয় পরে কোনো সময় আসব।

বোস। ওই সিঁড়ির ওপরে বোস।

আপনি তো এখন পুজোয় বসবেন, অনেক দেরি হবে।

খিদে পেয়ে যাবে? কিছু খেয়ে আসিসনি?

না, সেজন্য নয়।

খালি পেটেই ওষুধটা খেতে হয়।

দ্বারিক আর কথা বাড়ালো না! গোষ্ঠ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে হরিণের চামড়া পেতে পুজোয় বসে পড়েছেন। কতক্ষণ ধরে এই পুজো চলবে কে জানে!

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিত্বটা অনেকটা ক্লাসিক্যাল ধরনের। সত্তর বছরেও সরল ঋজু শরীর, যথেষ্ট লম্বা ও ফর্সা, কণ্ঠস্বর গমগমে ও তিনি বদরাগি। লাল রঙের ধুতি পরে তিনি হরিণের চামড়া পেতে পুজোয় বসেন। সবসময়ই তিনি ওইরকম টকটকে লাল রঙের ধুতি পরে বেড়ান। কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। অথচ উনি সত্যিই তো বসে আছেন অদূরে এবং দ্বারিক জন্ম থেকেই ওঁকে ওইরকম দেখছে। যেন গত শতাব্দী থেকে হঠাৎ ছিটকে আসা একজন মানুষ।

একটা হাত খানেক লম্বা কালীর মূর্তি, ফুল বেলপাতায় প্রায় পুরোটাই ঢাকা। দ্বারিক কোনোদিন মূর্তিটা ভালো করে দেখেনি। তবে সে শুনেছে যে মূর্তিটা নাকি কষ্টিপাথরের,

জিভটা সোনার। একবার এই মূর্তিটা চুরি হয়েছিল। দু-দিনের মধ্যেই চোরের নাকি ওলাওঠা হয়, চোরের বউ নিজে এসে মূর্তিটা ফেরত দিয়ে যায়।

হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয়। কিংবা, দ্বারিক ভাবে, ইচ্ছে করেই এ-রকম একটা গল্প রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে তার স্মৃতির বয়েস থেকেই এটা শুনে আসছে।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য শব্দ করে মন্ত্র পড়েন না। কিন্তু তাঁর শরীরটা একটু একটু দুলছে। তার ডানপাশের একটা তামার রেকাবিতে কী যেন একটা জিনিস পুড়ছে। তার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে। অত ধোঁয়ার মধ্যে বসে থাকাও সহজ কথা নয়, নিশ্চয়ই চোখ বুজে আছেন উনি।

যতটা দেরি হবে বলে দ্বারিক আশঙ্কা করেছিল, অতটা অবশ্য হল না। নিষ্ঠাবান মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ার মতন গোষ্ঠ ভট্টাচার্যও দিনে চার-পাঁচবার পুজোয় বসেন। যখনই তাঁর মেজাজ খুব বেশি গরম হয়ে যায়, ব্রহ্মতালুতে আগুন জ্বলে, তখনই তিনি নিজেকে শান্ত করবার জন্য আশ্রয় নেন ঠাকুরঘরে।

দু-বার মা মা ডেকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোষ্ঠ ভট্টাচার্য পেছন ফিরলেন। দ্বারিককে বললেন, দাঁড়া, ওষুধটা বানিয়ে দিচ্ছি এবার।

তামার রেকাবিতে যে জিনিসটা জ্বলছিল তার ওপর জল ছিটিয়ে দিলেন খানিকটা। তারপর সেই ছাইয়ের সঙ্গে নানারকম জিনিস মেশাতে লাগলেন। মনে হল যেন কপূর, চন্দন এইসবও মেশাচ্ছেন। একটা কলাপাতায় সেই থকথকে জিনিসটা তুলে নিয়ে দ্বারিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, রোজ সকালে একটু করে খাবি। মোট চারদিন। দেখবি, ওটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাবে। একটু একটু করে ভেঙে নিয়ে গলায় ফেলে দিলেই হল। এখন একটু খেয়ে নে।

এখনই?

হ্যাঁ, তুলে নে একটু আঙুলে করে। জল দিচ্ছি, ধুয়ে নিবি। তারপর প্রসাদ দেব।

দ্বারিক একটু ইতস্তত করতে লাগল। এসব ছাইভস্ম খাওয়ার কোনো মানে আছে কী? অথচ অনেকের নাকি সেরেও যায়।

জ্যাঠামশাই, আপনাকে একটা কথা বলব?

কী?

যাদের বিশ্বাস নেই, তাদেরও কি এই ওষুধে কাজ হয়?

বিশ্বাস? কার বিশ্বাস নেই, তোর? চীনেরা কিংবা রাশিয়ানরা কালীঠাকুর মানে না বলে বুঝি তোরাও মানিস না?

আমাদের দেশেও অনেক নাস্তিক আছে। সেই রামায়ণ-মহাভারত-এর আমলেও ছিল।

ওসব বাজেকথা রাখ। বিশ্বাস কি সকলে করতে পারে? যেসব অজ্ঞ মূর্খের দল এসে রোজ ঠাকুরের সামনে মাথা ঠুকে যায়, তারাই কি জানে বিশ্বাসের মর্ম। সাধনার একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছোলে তবেই প্রকৃত বিশ্বাস আসে। তোদের মতন লোকদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দায় আমরা নিয়ে নিয়েছি। নে, খা!

দ্বারিক অনুভব করল, জ্যাঠামশাই তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোক এঁকে মানে। উনি দেখতে চান, দ্বারিক ওঁকে অমান্য করার সাহস রাখে কিনা। সেইজন্যই ছাই গুলে ওকে খেতে দিয়েছেন।

আঙুলে করে খানিকটা তুলে নিয়ে দ্বারিক মুখে দিল। জিনিসটা খেতে মন্দ নয়। একটু যেন আদা আর কপূরের স্বাদ আছে। চাটনি হিসেবে এর সবটাই দ্বারিক এক্ষুনি খেয়ে ফেলতে পারে।

কুশিতে করে জল এনে গোষ্ঠ ভট্টাচার্য সন্তুষ্ট গলায় বললেন, হাতটা ধুয়ে নে। এবার প্রসাদ দিচ্ছি।

এ বাড়ির প্রসাদ দ্বারিক ছেলেবেলায় অনেক খেয়েছে। শশা, কলা, বাতাসার সঙ্গে খুব সুন্দর নাড় থাকে। ক্ষীর আর নারকোল দিয়ে তৈরি। সেই নাড় খাওয়ার শিশুকালের লোভটা তার জেগে উঠল।

কিন্তু আজ সেই নাড় নেই। শুধুই শশা, কলা, বাতাসা। এর একটাও দ্বারিকের প্রিয় নয়।

আজ পর্যন্ত এ বাড়িতে কোনোদিন ডাক্তার-কবিরাজ ঢোকেনি। এটা সত্যি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। এই সত্তর বছর বয়সেও জ্যাঠামশাই ভালো স্বাস্থ্য রেখেছেন। একবার সরকারের লোকেরা এ গ্রামে পক্সের টিকে দিতে এসেছিল, জ্যাঠামশাই নিজের বাড়িতে তাদের ঢুকতে দেননি। অবশ্য, জ্যাঠামশাইয়ের মেজোছেলে দিবাকরদা অনেকদিন কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন।

তুই তা হলে এখন গ্রামেই থেকে যাবি ঠিক করেছিস? তাই তো ভাবছি। তা ছাড়া বাড়িতে আর দেখবার কেউ নেই।

আত্মোন্নতির জন্য অনেকে বাপ-মাকে পরিত্যাগ করে। তুইও করলে পারিস। লেখাপড়া শিখেছিস, কলকাতায় গেলে চাকরি পেয়ে যাবি।

আমার দ্বারা বোধ হয় আর চাকরি-বাকরি করা সম্ভব হবে না, জ্যাঠামশাই।

আদর্শবাদীদের শেষ অবলম্বন স্কুল মাস্টারি। আজকাল অবশ্য ভোটে দাঁড়াবারও একটা ব্যাপার হয়েছে।

আমি তাহলে আজ উঠি?

খটাস খটাস শব্দ করে গোষ্ঠ ভট্টাচার্য দ্বারিকের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, সংবাদ শুনেছিস?

আজ্ঞে?

শুনিসনি? ওই যারা ডিপটিউবওয়েল খুঁড়ছিল, কাল সন্ধ্যে বেলা তারা জলের সন্ধান পেয়েছে।

দ্বারিক খবরটা শুনে খুশি হল। এদিকে রুক্ষ অনুর্বর মাটি। সহজে জল পাওয়া যায় না। পুকুরগুলোও শুকিয়ে যাচ্ছে। কুয়ো খুঁড়তে এসে ওরা তিন-চার জায়গায় জল পায়নি। অবশ্য দ্বারিকের সন্দেহ, তিন-শো ফুট অন্তত খোঁড়ার কথা, ওরা এক-শো-দেড়-শো ফুট খুঁড়েই ক্ষান্ত দেয়।

কিন্তু গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের পরের কথাটায় দ্বারিক আবার সাংঘাতিকভাবে চমকে উঠল।

রক্ত পেয়েছে তো! রক্ত না পেলে ধরিত্রী খুশি হবেন কেন?

রক্ত?

কেউ চুপিচুপি ওখানে নরবলি দিয়ে আমাদের মহাউপকার করে গেছে।

আপনি কী বলছেন জ্যাঠামশাই? নরবলি আবার কী?

ওখানে রক্ত পাওয়া যায়নি? তেঁতুলিয়ার মোড়ে একটা কাটা মুণ্ডু গড়ায়নি?

আপনি এইসব বাজে কথায় বিশ্বাস করেন? দারোগাটি তো ঠিক কথাই বলেছিল। রণকালীপুরের কবরখানায় একটা টাটকা কবরের মাটি খোঁড়া আছে। শেয়ালেরা হাড়গোড় বার করে আনে। একটা মুন্ডুও নিয়ে এসেছিল।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য গলার আওয়াজ বাঁকিয়ে বললেন, শেয়ালেরা বুঝি দাঙ্গা বাধাবার মতলব করে? মুসলমানের মুন্ডু পাঁচ মাইল দূরের হিন্দু গ্রামে এনে ফেলে?

জন্তুজানোয়ারেরা তো দাঙ্গার কথা জানে না। মানুষই এসব চিন্তা করে।

সেই কথাই তো বলছি। শেয়ালরা পাঁচ মাইল দূরে একটা মানুষের মাথা নিয়ে এল? কখনো কেউ এ-রকম শুনেছে? এ শেয়ালের কম্ম নয়। মানুষেরই কীর্তি। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ সহজে জিততে পারে না। যেখানে জেতেও, সেখানে এমন ভাব দেখাতে হয়, যেন প্রকৃতিই বড়ো। বলতে হয়, মা, তুমিই শ্রেষ্ঠ, আমরা তোমার অনুগ্রহ চাই। সেইজন্যই পুজোআচ্চার প্রয়োজন। দামোদরের ওপর যখন অত বড়ো বাঁধ বাঁধে তখন গভর্নমেন্ট নিজে থেকে কতগুলো নরবলি দিয়েছিল তোর মনে নেই? এমনকী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও দিয়েছে।

এসব একেবারে গাঁজাখুরি কথা।

তখন দিবাকর বর্ধমান সেটেলমেন্টে চাকরি করে। সে নিজে দেখেছে। কাগজে বেরিয়েছিল, দুর্ঘটনায় চারজন শ্রমিকের মৃত্যু। আসলে ওই চারজনকে বলি দেওয়া হয়েছিল! আমাদের এখানে তো ভালো বংশের ছেলেকে বলি দেওয়া হয়েছে। কাজও হল সঙ্গে সঙ্গে–

ধীরেনদার ছেলে বিটু...আপনি ভাবছেন তাকে কেউ বলি দিয়েছে? সেজন্যে আপনি খুশি হয়েছেন? বিধবার একমাত্র ছেলে।

বড়ো কাজ করতে গেলে ওরকম একটা-আধটা প্রাণ যায়ই! জল পেলে গ্রামের কত চাষির উপকার হবে, সেটা ভাবতো।

অন্য দেশের লোকেরা যে কুয়ো খোঁড়ে, ব্রিজ বানায়, তারা অন্য দেশের কথা জানি না। আমি জানি আমার নিজের দেশের কথা। যে দেশের যা শাস্ত্র, যে বিয়ের যা মন্ত্র!

কিন্তু নরবলি...আমাদের গ্রামে কে নরবলি দেবে...অন্য গ্রামের কেউ এসে তো আমাদের গ্রামে...কার এমন...

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য হাসলেন। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো সোজা দ্বারিকের চোখের সঙ্গে গাঁথা।

নরবলি কেউ দেয় না। মা নরবলি নেন। যার হাত দিয়ে সেটা হয়, সে নিমিত্তমাত্র। এ গ্রামে সেরকম দু-জন লোকই আছে। আমি, অথবা তুই। লোকে তোর কথাই বেশি বলাবলি করছে।

এবার দ্বারিকও হাসল। গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছেন। নিছক স্নেহভরে তিনি আজ সকাল বেলা দ্বারিককে ডেকে আনেননি। তাঁর আসল মতলবটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

বিটু ফিরে এলেই এসব গুজব আবার ধামাচাপা পড়ে যাবে।

সে ফিরে আসবে?

তার একটা কিছু খোঁজ পাওয়া যাবেই। একটা নিরীহ সাধারণ ছেলে, তাকে তো আর কেউ এমনি এমনি মারতে যাবে না।

নিরীহ ছেলেরা বুঝি এমনি এমনি মারা পড়েনি এর আগে? এঃ হে হে হে হে! তুই একথা বলছিস? এখন তোরা সব সাধু সেজেছিস বুঝি?

আমাদের দলের ছেলেরাই বেশি মারা গেছে। আমরা একটা যুদ্ধে নেমেছিলাম...দেশের জন্য।

এটাও তো দেশের কাজ। চাষের জন্য জল ভোলা দেশের কাজ নয়?

জ্যাঠামশাই, এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

যৌবনকালে আমি এক কোপে একটা পাঁঠা কাটতে পারতাম, এখন বয়েস হয়েছে, অতটা আর শক্তি নেই। কাল মল্লিকপুরের হাট ছিল। শুনলাম সেখানে লোকেরা বলছে, এ তল্লাটে মানুষ কাটার অভিজ্ঞতা একমাত্র দ্বারিক হালদারেরই আছে।

না জ্যাঠামশাই, পাঁঠা কাটা কিংবা মানুষ কাটা, কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই।

মহাদেব সাহার কাকা ভূষণ সাহা, তার দেহটা তিন টুকরো হয়ে পড়েছিল কদমতলীর কাছে। তাকে কে কেটেছিল? তোর ছোটোভাই ভুতো, সে কেটেছিল।

দ্বারিকের শান্ত ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। সাংঘাতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তার সারাশরীরে। এইসব সময় সে খুব দুর্বল হয়ে যায়। তার ঘাড়ের দু-পাশ টনটন করে।

সে চোয়াল শক্ত করে বলল, না। ও-ব্যাপারে ভুতোর কোনো হাত ছিল না। কিন্তু এসব পুরোনো কথা কি এখন আলোচনা করবার কোনো দরকার আছে?

লোকে যা বলছে, তাই বললাম।

লোকে যা বলছে, তা শুধু আপনি শুনলেন? আমার কানে তো কিছু আসেনি।

আসেনি, আসবে। এখন লোকে তোর আড়ালে বলছে, পরে সামনেই বলবে। সেইজন্যই বলছিলাম, তুই কিছুদিন কলকাতায় গিয়ে থেকে আয়। আর ভুতোর বউ বলে পরিচয় দিয়ে যে মেয়েটা আছে, ওকেও নিয়ে যা।

জ্যাঠামশাই একটা কথা বলুন তো। আমরা গ্রামে থাকলে আপনার কোনো অসুবিধে আছে?

আমার সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন এখানে নেই। আজকাল সমাজের সেই দৃঢ় বাঁধন আর নেই। অনেক কিছুই ভেঙে পড়ছে। কিন্তু তবুও তো একটা সীমা আছে! ন্যায়-নীতি তো

দেশ থেকে একেবারে উঠে যায়নি। ভুতোর বউ বলে যে মেয়েটাকে তোরা বাড়িতে রেখেছিস তার পদবি তো ছিল শীল, তাই না?

হ্যাঁ।

তুই অস্বীকার করলেও কোনো লাভ হত না। আমার চেনা একজন লোক বহরমপুরে গিয়েছিল। সে খোঁজ এনেছে। একটা শুদুরের বাড়ির মেয়ে বামুনের বাড়িতে এসে বলল, আমি তোমাদের ছেলের বউ, অমনি সবাই তাকে মেনে নিল, এদিকে সে ছেলেরই পাত্তা নেই, এ-রকম কখনো হয়? তোর বাপটা এমন পাগল, আর মা-টা তো জন্ম-দুঃখী। সেই সুযোগ নিয়ে তোরা যা-তা করছিস। তা বলে আমরা চোখ বুজে থাকব? গ্রামের ছেলে মেয়েদের সামনে এ-রকম একটা দৃষ্টান্ত ঝুলিয়ে রেখে তাদেরও উচ্ছন্নে পাঠাব?

একটি বছর পাঁচেকের ফুটফুটে ছেলে দৌড়ে এসে গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের পাশে দাঁড়াল, ওঁর কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চ গ্রামে উঠছে, চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। বাড়ির লোকজন শুনছে সবই, তাই বোধ হয় ওঁকে শান্ত করার জন্য বাচ্চাছেলেটিকে পাঠিয়েছে। দিবাকরদার পর পর পাঁচটি মেয়ে হওয়ার পর এই ছেলেটি জন্মেছে। এ না জন্মালে এ বংশে বাতি দেওয়ার আর কেউ থাকত না। তাই এই নাতিটি গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের খুব আদরের।

ভুতো আজও ফিরল না, আর কোনো দিন ফিরবে কিনা সন্দেহ। তুই বিয়ে করিসনি, বাড়িতে একটা সোমত্থ মেয়ে...এসব কি ভদ্রলোকের বাড়ির ব্যাপার।

আমাদের বাড়ির ব্যাপার নিয়ে আপনাদের চিন্তা না করলে বুঝি চলে না?

নিশ্চয়ই চিন্তা করতে হবে! গাঁয়ের একটা শুচিতা বলে কিছু নেই?

গাঁয়ে শুচিতা আছে? হাজার রকমের নোংরামি।

তোদের জন্যই তো...বাপ-মার চোখের সামনেই একটা অন্য জাতের মেয়েছেলে নিয়ে ঢলাঢলি...

জ্যাঠামশাই, এই ওষুধটা আমার দরকার নেই।

ওটা তোর ভালোর জন্যই দিয়েছি। ওটা খেলে কাজ হবে। তোর ভালোর জন্যই বললাম, ওই মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে, তুইও কিছুদিন শহরে থেকে আয়। তোর বাপ-মাকে দেখার লোকের অভাব হবে না।

ছোটাছেলেটি এসে না পড়লে হয়তো দ্বারিক কলাপাতা মোড়া জিনিসটা গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের মুখে ছুড়েই মারত। তা না করে সে সেটাকে আস্তে নামিয়ে রাখল সিঁড়ির ওপরে।

৫. বিহার থেকে নুটু

বিহার থেকে নুটু, রাজেন ওরা পাঁচজন আজ ফিরবে। দ্বারিক ওদের জন্য দাঁড়িয়েছিল মল্লিকপুরের বাস স্ট্যাণ্ডে।

আরও আট-দশ জন ছেলে জমায়েত হয়েছে সেখানে। তাদের মধ্যে দু-তিনজন দ্বারিককে দেখে সিগারেট লুকোলো। এই বেল্টে ডাইরেক্ট অ্যাকশানের সময় দ্বারিক নিজে এখানে বেশিদিন উপস্থিত ছিল না। কিন্তু এরা সবাই দ্বারিকের মুখ চেনা। দ্বারিক জেল থেকে ফেরার পর কিছুদিন এরা তাকে এড়িয়ে গেছে, সামনাসামনি দেখা হলেও কথা বলেনি। এখন আবার কাছাকাছি আসছে। তাকে সম্মান দেখাচ্ছে।

দ্বারিকের খানিকটা গোপন আনন্দ হল। আবার তাহলে দল গড়া যায়। আবার শুরু করা যায় কাজ। এবার প্রোগ্রাম অন্যরকম হবে। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে।

বাস থেকে ওরা নামল হই হই করে। নুটু, রাজেন, সুখময়, অনন্ত আর রবি।

দ্বারিকা, দ্বারিকদা বলে চেঁচিয়ে ওরা সবাই জড়িয়ে ধরল তাকে। দ্বারিক দুর্বল গলায় বলল, রেলস্টেশনে যেতে পারিনি, সুখময়ের বাড়ি থেকে খবর পেলাম অনেক দেরিতে।

অন্যান্য ছেলেরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিল। তারপর গান ধরল, উই শ্যাল ওভারকাম।...জেলে বসে দ্বারিকও এই গানটা গাইত, সে-ও গলা মেলালো ওদের সঙ্গে।

ওরা পাঁচজনই জিজ্ঞেস করল, দ্বারিকদা, ভুতো ফেরেনি? দ্বারিক দু-দিকে মাথা নাড়ল।

ওরা সে-সম্পর্কে আর কোনো কৌতুহল দেখালো না। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল প্রসঙ্গান্তরে।

ওদের উল্লাসের কোলাহল শুনে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে বাস স্ট্যাণ্ডে। অনেক দোকানদার দোকান ফেলে দেখতে ছুটে এসেছে। এই ভিড়ের অনেকেই ওদের চেনে না।

থেমে-থাকা বাসটার জানলা দিয়েও অনেক অবাক চোখ এদিকে মেলা। এই পাঁচজনের বাবা কাকা-দাদা যাঁরা এসেছেন, তারা দাঁড়িয়ে আছেন একটু দুরে।

সুখময় বলল, দ্বারিকদা, তুমি কিছুদিন হাজারিবাগ জেলে ছিলে না?

দ্বারিক বলল, হ্যাঁ।

তুমি যে সেলে ছিলে, ঠিক সেটাতেই আমি ছিলাম। ইয়াসিন মিঞাকে তোমার মনে আছে। সে তোমার কথা খুব বলছিল–

এদের মধ্যে চারজনই ধরা পড়েছে শেষের দিকে, দু-আড়াই বছরের বেশি জেলে থাকেনি। একমাত্র নুটুই পাঁচ বছরের বেশি। একবার জেল ব্রেকে নুটু বাইরেও চলে এসেছিল, আবার ধরা পড়ে।

ওরা পাঁচজনেই দাড়ি রেখেছে। চুল বেশ বড়ো বড়ো। জামাকাপড় অবশ্য পরিচ্ছন্ন। রাজেন, সুখময় আর রবির স্বাস্থ্যও বেশ ভালো হয়েছে। নুটু যে আলসারে ভুগছে, সে-খবর দ্বারিক আগেই পেয়েছিল। অনন্তটা অকালে বুড়িয়ে গেছে দ্বারিকের মতন।

দলবল মিলে হাঁটা শুরু করল গ্রামের দিকে। অনেকদিন পর তৃপ্তি বোধ করছে দ্বারিক। ওরা এসে পড়ায় সে খুবই খুশি হয়েছে। এতদিন তার বড় একা একা লাগছিল। ওরা অবশ্য সবাই মল্লিকপুরের, মোরামডাঙার আর একজনও নেই, তা হোক, তবু তো কাছাকাছি।

যেন প্রাক্তন সৈনিকেরা অনেকদিন পরে দেশে ফিরছে। যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক, নিজের বাড়িতে ফেরার আনন্দ তো আছেই। না ফিরতেও তো পারত। জেল ব্রেকের সময় নুটুর পায়ে গুলি লেগেছিল, আর দু-তিন ফুট উঁচু দিয়ে গুলিটা এলেই সে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যেত। সুখময়ের ওপর যা অত্যাচার হয়েছে, কিংবা রবি। অসাধারণ প্রাণশক্তি বলেই বেঁচে উঠতে পেরেছে। অনেকসময় পুলিশ তো অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাওয়ার বদলে

মাঠে-ঘাটে দাঁড় করিয়ে মেরেছে। নিরস্ত্র বিপ্লবীদের সেইভাবে মারার নাম দিয়েছে তারা কনফ্রন্টেশন।

এরা পাঁচজন বেঁচে আছে। বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড়োকথা।

বাড়ি ফিরে ওরা কে, কী দেখবে তা এখনও জানে না। জেল আর অজ্ঞাতবাস মিলিয়ে ওরা সবাই পাঁচ-ছ বছর ঘর ছাড়া। জেলে থাকার সময় বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু চিঠিতে তো সবসময় সত্যি কথা লেখে না। ভিজিটার গেছে কদাচিৎ।

দ্বারিক রবির কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে। তার বুকের মধ্যে শিরশির করছে। রবি কী জানে যে এর মধ্যে তার মা মারা গেছেন। যদি বা জানেও, এতদিন পর মাতৃশূন্য বাড়িতে ফেরাটা ও সহ্য করতে পারবে? একটা কান্নার রোল উঠবেই। কান্নার কথা ভাবলেই দ্বারিকের ভয়। হয়। সে তো কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারবে না।

নুটুদের বাড়িতে অবশ্য কেউ মারা যায়নি। কিন্তু ওদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। নুটুর বাবা বাতের অসুখে ভুগে অকর্মা হয়ে গেছেন। নুটুর আর কোনো ভাই নেই। এখন ওদের সংসার চলে জমি বেচে। তাও প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে। নুটুদের গোয়ালঘরের পেছনটায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ ছিল। খুব বাদুড়ের বাসা ছিল সেইসব গাছে। অনেকে ওখানে দিনের বেলা বাদুড় দেখতে যেত। সেইসব গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। গোয়ালঘরটাও আর নেই। সব জায়গাটা চষে ফেলে মটর ডালের চাষ হচ্ছে। দ্বারিক গতকাল দেখে এসেছে। নুটু প্রথমে নিজেদের বাড়িটাই চিনতে পারবে না।

সুখময়দের বাড়িতে আজ সকলের নেমন্তন্ন। সুখময়ের মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। অন্য চারজনের বাড়িতে খবরও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই মর্মে।

প্রথমেই পড়ল অনন্তর বাড়ি। ওর মা-বাবা অনেকদিনই নেই। কাকার সংসার। এমন নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা দেখে দ্বারিকের কষ্ট হল খুব। এতদিন পর ফিরল ছেলেটা অথচ বাড়িতে এমনভাব যেন না ফিরলেও ক্ষতি ছিল না! দ্বারিক নিজে যেদিন ফেরে, সেদিন তার মা

পাগলের মতন তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দ্বারিক যেন দু-বছরের শিশু, এইভাবে তার মুখে বার বার হাত বুলিয়েছিলেন মা।

অনন্তর কাকা একদিন দ্বারিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা যেসব জেলফেরত দাগি হয়ে গেলে, এরপর তোমরা আর কোনো ভালো জায়গায় চাকরি পাবে? তুমি তো না হয় তবু বি এস সি পাস করেছ, অনন্ত তো তাও করেনি।

সকলেরই এত বেশি স্বার্থচিন্তা যে কেউ স্বার্থত্যাগের মূল্য দেয় না।

অনন্ত অবশ্য নিরুত্তাপ। আবহাওয়াটা গ্রাহ্য না-করে নিজেই সেটাকে উত্তপ্ত করে তুলল। ইস, কাকিমা, তুমি কী রোগা হয়ে গেছ! আমার জন্য খুব চিন্তা করতে বুঝি?—এইকথা বলেই সে কাকিমার দুটি ছেলে-মেয়েকে তুলে নিল দু-হাতে। এদের মধ্যে একজনের বয়েস তিন, সে অনন্তকে কখনো দেখেইনি।

সুখময়দের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বড়ো বেশি হয়ে গেল। নারকেলচিংড়িটা এত ভালো হয়েছিল যে দু-তিনবার চেয়ে নিতেও লজ্জা হয়নি দ্বারিকের। এত বড়ো চিংড়ি সুখময়ের বড়দা জোগাড় করলেন কী করে কে জানে! এদিকের বাজারে ঘুষো চিংড়ি ওঠে মাঝে মাঝে, কিন্তু বাগদা চিংড়ি তো দেখাই যায় না।

জেলে সুখময়রা একবার অনশন করেছিল দিন দশেকের জন্য। সেও বছর খানেক আগেকার কথা। সুখময়ের মা সে-শোক আর ভুলতেই পারছেন না কিছুতেই! পরিবেশন করার সময় বারংবার বলছিলেন, নে, আর একটু নে। কতদিন না খেয়ে থেকেছিস! দশদিন কিছু খাসনি? অতদিন না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে?

সুখময়ের দাদা জিজ্ঞেস করলেন, দু-একদিন পরে বোধ হয় খিদের বোধটা চলে যায় না রে?

দ্বারিক সমেত ওদের ছ-জনেরই বিভিন্ন সময়ে অনশনের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু অনশনের প্রসঙ্গে ওরা সবাই হাসছিল খুব। সুখময় বলল, না মেজদা, একদম ভোলা যায় না। সবসময় শুধু খাবার জিনিসের কথা মনে পড়ত, এমনকী যে খাবার কখনো খাইনি, যেমন ধরো কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা, আমি শুধু নামই শুনেছি, চোখে দেখি নি কখনো, অথচ মনে মনে ভাবতাম, সেই সরপুরিয়া, সরভাজা খাচ্ছি।

সুখময়ের মা বললেন, আহা রে! এবার কলকাতায় কেউ গেলে ও জিনিস আনিয়ে দেব ততার জন্য।

রবি বলল, আমি তো ভাবতাম, ছাড়া পেয়ে আমি একটা তেলেভাজার দোকান খুলব! আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি...।

অনন্ত বলল, ভেবেছিলাম ছাড়া পেলে কত কী করব! চেঁচাব, লাফাব, গান গাইব, মাটিতে গড়াগড়ি দেব, অথচ সেরকম কিছুই করা যাচ্ছে না! সবাই কেমন যেন সাধারণ...।

নুটু বলল, ছেলেবেলায় স্কুলের সময় যেমন ভাবতাম, পরীক্ষা শেষ হলেই কত কী করব, অথচ কিছুই করা যেত না।

সুখময়ের মা বললেন, এখন কিছুদিন ভালো করে বিশ্রাম নাও তোমরা সবাই।

দ্বারিক মনে মনে ভাবল বিশ্রাম নয়। এখন দরকার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া...জেলখানার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে সত্যিকারের কোনো কাজে লেগে পড়লেই শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ভালো হবে।

গুরুজনরা ঘিরে আছে বলে দ্বারিক বিশেষ কোনো কথা বলতে পারছে না। কিন্তু তার ইচ্ছে, আজই ওদের সঙ্গে নতুনভাবে কিছু সংগঠনের বিষয়ে আলোচনা করে।

সেই সুযোগ পাওয়া গেল একটু পরে, যখন সুখময় বলল, চলো একটু কাঁঠালতলায় গিয়ে বসি। মেঘলা মেঘলা আছে, বাইরে খোলা হাওয়ায় বসলে ভালো লাগবে।

আসল উদ্দেশ্য সিগারেট টানা। কাঁঠালতলা বেশ পরিষ্কার, এখানে বেশ কিছু কাঁঠাল আর লিচুগাছ লাগিয়েছিলেন সুখময়ের বাবা। কয়েকটা গাছে বেশ সুদর্শন এঁচোড় ফলে আছে।

শুকনো লিচুপাতার ওপর বসে একটুক্ষণ আরামে ধূমপান করার পর দ্বারিক প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল।

আমরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি, এভাবে থাকলে কিন্তু আমাদের এতদিনের কাজ সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের সবাই মিলে এখন একবার বসা দরকার। তোরা কিছু ভেবেছিস, ভবিষ্যতের প্ল্যান।

পাঁচজনের কেউ একটাও কথা বলল না। যেন পাঁচজন পাঁচরকমভাবে চিন্তিত।

দ্বারিক আবার বলল, আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সেটাও আমরা খোলাখুলি আলোচনা করে, শেষপর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসতে পারি। পুরোনো থিসিসগুলো এখন আবার রিভিউ করা দরকার।

এবারও কোনো সাড়া জাগল না। দু-জন মন দিয়ে সিগারেট টানছে, বাকি তিনজনের চোখ মাটির দিকে।

দ্বারিক এবার সরাসরি প্রশ্ন করল, নুটু, তুই কিছু ভেবেছিস এ সম্পর্কে?

নুটু বলল, নিরঞ্জনদার কী খবর?

নিরঞ্জন থাকে ধানকা গ্রামে। সে ছাড়া পেয়েছে মাস ছয়েক আগে। দ্বারিকের চেয়েও সে বয়সে কিছু বড়ো, এ অঞ্চলের বিপ্লবী দলের সেই ছিল স্বীকৃত নেতা। শিলিগুড়ির সঙ্গে তারই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। দ্বারিক তিন-চারবার দেখা করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। কিন্তু জেল থেকে ফিরে সে যেন কেমন পাগলাটে হয়ে গেছে। বাস্তবকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। সে একধার থেকে সমস্ত নেতার নাম করে তাঁদের শোধনবাদী বলে

গালাগাল দিয়ে গেল দ্বারিকের সামনে। সে চায় সাঁওতালদের নিয়ে দল সংগঠন করে এক্ষুনি আবার সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দ্বারিককে সে বলেছে। মায়ের আঁচলের তলায় গিয়ে যারা এখন লুকোতে চায়, তাদের সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি তাদেরও শ্রেণিশত্রু বলে মনে করব।

নিরঞ্জনকেও ডাকব আমরা। তার কথা শুনব। আমি অবশ্য তার সব মতামত এখন মেনে নিতে পারি না। তোরা শুনে দেখিস।

নুটু বলল, তুমি জান দ্বারিকদা, টর্চারের সময় নিরঞ্জনদা অনেকের নাম বলে দিয়েছিল?

দ্বারিক দু-হাত তুলে বলল, প্লিজ, প্লিজ! ওসব পুরোনো কথা তুলে এখন কোনো লাভ নেই। সকলের সহ্যক্ষমতা সমান থাকে না। কেউ যদি শেষ পর্যন্ত টর্চার সহ্য করতে না পেরে থাকে, সেজন্য তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। আমরা যদি এখন পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে থাকি, তাহলে পার্টি হিসেবে আমরা শেষ হয়ে যাব! নিরঞ্জন মানুষ হিসেবে জেনুইন।

উনি কী করছেন এখন?

আপাতত কিছুই করছে না।

আমরা তখন সবাই প্রায় ছাত্র ছিলাম। এখন এতদিন পরে আবার ক-জন নতুন করে পড়াশুনো করতে পারবে আমি জানি না। অন্তত আমি তো পারব না। আমার দ্বারা আর বইখাতা নিয়ে কলেজে যাওয়া পোষাবে না। একটা কিছু জীবিকার খোঁজ করতে হবে।

সে সমস্যা তো আছেই। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককেই একটা দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে হবে। কিন্তু আমি বলছি দলগতভাবেও আমাদের আবার এক হওয়া দরকার।

রাজেন বলল, তার আগে দেখতে হবে দ্বারিকদা, আমাদের কী কী ভুল হয়েছিল।

দ্বারিক বলল, সে তো দেখা দরকারই। ভুল তো হতেই পারে। সেই ভুল থেকে নতুনভাবে শিক্ষা নেওয়া যায়। খাঁটি বিপ্লবীকে হতে হবে একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিক, কিন্তু আমরা–

অনন্ত বলল, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, এই স্লোগান তুমিই প্রথম আমাদের শিখিয়েছিলে দ্বারিকদা। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম তখন, তুমি আমায় ধমকে দিয়েছিলে। আজ তোমরাই বলছ, ওই স্লোগান দেওয়া ভুল হয়েছিল।

দ্বারিক বলল, হ্যাঁ, স্বীকার করছি। আমাদের আরও ভুল হয়েছিল যেমন–

রবি বলল, যেমন আমরা জনসাধারণকে কনফিডেন্সে নিইনি, আমাদের কাজ বা উদ্দেশ্য তাদের বোঝাতে যাইনি, গোড়া থেকেই আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টি হয়ে গেলাম।

বিভিন্ন সেল তাদের ইচ্ছেমতন কাজ শুরু করল, কোনো কোঅর্ডিনেশন ছিল না, আমি যখন মেদিনীপুরে লুকিয়েছিলাম, তখন ক্যাডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখলাম, স্টুডেন্ট ফ্রন্টের সঙ্গে পিজান্ট ফ্রন্টের কোনো সংযোগ নেই।

ভুল সম্পর্কে ওরা ওদের মতামত জানাতে লাগল তীব্র ভাষায়, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল দ্বারিক। সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে বলে ওদের গলায় রয়েছে অভিমানের সুর। নইলে, যতগুলো ভুলের কথা ওরা বলছে, তার সব ক-টাই ভুল ছিল না। সার্থক না হওয়া মানেই পথটা ভুল নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে ভুল হয়। পাঁচবার-সাতবার এ-রকম ব্যর্থ হলেও পথটা ঠিক রাখা চাই। যারা ঘন ঘন পথ বা মত বদলায় তাদের দিয়ে কোনো কাজই হয় না। পরে আস্তে আস্তে ওদের এসব বুঝিয়ে বলতে হবে।

ওরা একটু থামলে দ্বারিক বলল, আমি আর একটা জিনিস নতুনভাবে অনুভব করছি কিছুদিন থেকে। আমরা কুসংস্কার বা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে কখনো আঘাত দিইনি। অথচ, সেগুলো দূর না করলে কি দেশের মানুষের মন পরিবর্তন করা যাবে? সবাই ভাগ্য মেনে বসে আছে। ধর্মের আসল অস্তিত্ব কিছু নেই। শুধু কতকগুলো সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা

সবাই। তোরা কি ভাবতে পারিস যে এখনও লোকে বিশ্বাস করে, নরবলি দিলেই তবে কুয়ো থেকে জল উঠবে। চরণামৃত খাবার জন্য লোকে এখনও মন্দিরের সামনে লাইন লাগায়। একটা ফিয়ার সাইকসিস, একটা সার্বজনীন ভয় যেন দেশটার ওপর চেপে বসে আছে। ভূতপ্রেতের ভয়, ঠাকুর-দেবতার ভয়, পুলিশের ভয়, পাপের ভয়, জাত যাবার ভয়, এর সঙ্গে আছে জোতদার মহাজনকে ভয় পাওয়া, গভর্নমেন্টের লোকদের ভয় পাওয়া–নিরীহ নিরীহ লোক কোনো দোষ করেনি, তবু সবসময় একটা ভীতু ভীতু ভাব–এইসব দূর করার জন্য আমরা কোনো চেষ্টা করিনি, আগেও কোনো কাজ হয়নি–তোদের কি মনে হয় না, এখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত?

নুটুর ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল, তার মনে হল, দ্বারিকা এখন বিপজ্জনক রাজনীতি ছেড়ে সোশ্যাল ওয়ার্কার সাজতে চাইছেন। সুবিধাবাদী ফাঁকা আইডিয়ালিস্টদের যেটা একটা সময় কাটাবার ছল।

দ্বারিক ভেবেছিল সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনছে। তার গলার আওয়াজে অনেকখানি আবেগ এসে গিয়েছিল। হঠাৎ রবি দুম করে একটা অন্য কথা বলল।

আচ্ছা দ্বারিকদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ভুতো কি শেষদিকে পুলিশের স্পাই হয়ে গিয়েছিল?

দ্বারিকের সারাশরীর কেঁপে উঠল। কথাটা বুঝতে তার সময় লাগল খানিকটা। এ-রকম কথা যে কেউ বলতে পারে, তাই সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তুই কী বলছিস রবি?

সবাই ধরা পড়ল, একমাত্র ভুতোই ধরা পড়ল না, এটা কখনো সম্ভব?

ভুতে ধরা দিতে চায়নি।

আমরাও চাইনি। কিন্তু ভুত একলা একলা কোথায় লুকিয়ে থাকবে এতদিন? সে কি বিদেশে পালিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীছেলে হয়ে গেছে।

না। বিদেশে গেছে শহরের ছেলেরা। ভুতো গ্রামের একজন গরিব মাস্টারের ছেলে, সে বিদেশে যাওয়ার টাকা পাবে কোথায়?

পালিয়ে থাকতে হলেও অনেক টাকা লাগে। দ্বারিকদা! আমরা শুনেছি, পুলিশ থেকেই ব্যবস্থা করে এ-রকম কয়েকজনকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে বিভেদ ঘটাবার জন্য পুলিশ অনেক গুজবও ছড়িয়েছে, সেটা তো বোঝা উচিত?

পুলিশের ছড়ানো গুজব চিনে নেওয়ার মতন বুদ্ধি আমার আছে।

তা হলে ভুতো সম্পর্কে এ প্রশ্ন উঠছে কেন?

ভুতো আগেও দু-একটা এমন কাজ করেছে, যে সম্পর্কে পার্টির কোনো নির্দেশ ছিল না।

কোন কাজ? ওর বিয়ে করা?

না, না, ওর বিয়ে করা সম্পর্কে তো আপত্তির কিছু নেই। বিয়ে করেছে, বেশ করেছে। ভুতো বিয়ে না করলে ওই মেয়েটিই তখন খুব বিপদে পড়ত।

তা হলে?

ভুতো আর্মস বিক্রি করতে গিয়েছিল।

বাজে কথা, একদম বাজে কথা! এটাও গুজব।

পুলিশের কোনোরকম সাহায্য ছাড়া ভুতোর পক্ষে এতদিন পালিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তুই বরাবর ভুতোকে হিংসে করতিস, আমি জানি। সেইজন্যই তুই এ-রকম একটা জঘন্য কথা বলছিস।

অনন্ত বলল, আহা, দ্বারিকদা, চটে যাচ্ছ কেন? আমরা সবাই জানি, তুমি কখনো মিথ্যে কথা বল না। সেইজন্যই তো রবি তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। ভুতো পুলিশের স্পাই হয়েছে কিনা! আমাদের জেলে এ-রকম একটা কথা খুব ছড়িয়েছিল।

দ্বারিক ব্যাকুলভাবে বলল, অনন্ত, তুই ভুতোর সঙ্গে ক্লাস ফাইভ থেকে পড়েছিস, আমাদের বাড়িতে এসে তুই ভুতোর সঙ্গে এক খাটে শুয়েছিস কতদিন, তুই ওকে এতদিন ধরে চিনিস, তুই কি বিশ্বাস করতে পারিস যে ভুতোর পক্ষে এ-রকম কাজ করা সম্ভব?

রবি বলল, এই দেখো, দ্বারিকদা, তুমি আবার এড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি নিজে উত্তর না দিয়ে অনন্তকে দিয়ে বলাতে চাইছ।

দ্বারিকের রোগা লম্বা শরীরটা উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে। সে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাল। এরা সবাই তা হলে সন্দেহ করছে ভুতোকে? যে ভুতো ছিল ওদের হিরো। দ্বারিক এক্ষুনি ভুতো সম্পর্কে এমন একটা কথা বলতে পারে যাতে সবাই চুপ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে-কথা এখন দ্বারিক কিছুতেই বলতে পারবে না।

৬. পাছ পুকুরের জল

পাছ পুকুরের জল এত নোংরা যে ওখানে স্নান করতে প্রবৃত্তি হয় না। রান্নাঘরের পেছনে চারখানা টিন দিয়ে ঘিরে একটা ছাদখোলা বাথরুম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বীথি স্নান করে সেখানে।

জল আনতে হয় সরকার বাড়ির কুয়ো থেকে। দ্বারিকদের পানীয় জল বরাবর ওইখান থেকেই আসে, কিন্তু স্নানের জল কেউ কখনো ওখান থেকে আনেনি। বর্ষার সময়টা ওই পুকুরের জলেই চালিয়ে দিতে হয়। এদিকে জলের বড়ো কষ্ট। প্রত্যেকদিন স্নান করা এখানে বিলাসিতা। কিন্তু বীথি রোজ অতদূরের কুয়ো থেকে জল টেনে টেনে আনে, বড়ো বড়ো বালতির তিন-চার বালতি।

সে-দৃশ্য দেখে দ্বারিকের খুবই অস্বস্তি হয়। বীথি শহরের কলেজে-পড়া মেয়ে। কুয়ো থেকে জল তোলার অভ্যেস তার নেই, তার ওপর রোদুরের মধ্যে এতটা পথ ওই ভারী বালতি বয়ে আনা। যার গর্ভে একটি সন্তান নষ্ট হয়েছে, তার পক্ষে কি এত পরিশ্রম করা উচিত? পেটে ব্যথার জন্য একসময় বীথি অজ্ঞান হয়ে যেত, এখনও সব সেরেছে কিনা কে জানে!

অথচ অন্য কোনো উপায়ও নেই। জল আনার জন্য আর তো কোনো লোক নেই বাড়িতে। এক দ্বারিক নিজে এনে দিতে পারত। কিন্তু গ্রামে এ-রকম শিভাল্যরি চলে না। সে ভাসুর হয়ে রোজ ছোটোভাইয়ের স্ত্রীর স্নানের জল এনে দিচ্ছে, এটা হতেই পারে না। কেন পারে না? গ্রামের লোক এই নিয়ে পাঁচরকম কথা বলবে, এজন্য দ্বারিক ভয় পায়? গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই সেদিন এ-রকম একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিলেন। গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের মতামতটা গ্রামে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়। বলুক-না যার যা খুশি! আবার একথাও ঠিক, বীথি নিজেই রাজি হত না। দ্বারিক রোজ পরিশ্রম করে জল এনে দেবে, আর বীথি স্নান করবে, এ-রকম বিলাসী মেয়েও বীথি নয়। ব্যাপারটা সরল নয় মোটেই।

স্নান সেরে আসার পর বীথি মাঝখানের বড়ো ঘরটার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুর পরে। মাস দু-এক ধরে বীথির স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে। তার স্নানসিক্ত নির্মল মুখখানি দেখলে আর মনে হয় না যে, সে পরিশ্রমের জন্য ক্লান্ত। স্নানটা সে সত্যিই খুব উপভোগ করে।

প্রত্যেকদিন যা দেখা অভ্যেস, তার কোনো অনিয়ম হলে প্রথম দু-তিনদিন ঠিক খেয়াল হয় না, তারপর একটা খটকা লাগে।

খেয়ে-দেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে, রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দ্বারিকের একটু খটকা লাগল। রোজ সে খেয়ে ওঠার পর মিনিট পনেরো জিরিয়ে নেয়। সেইসময় সে খোলা দরজা দিয়ে মাঝের ঘরে আয়নার সামনে বীথির সিঁদুর পরার দৃশ্য দেখে। ওই দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এটা প্রতিদিনের ঘটনা। কিন্তু আজ, গতকাল বা পরশু সে বীথিকে সিঁদুর পরতে দেখেনি।

গ্রামের মেয়েদের মতন মোটা করে সিঁদুর পরার চল আজকাল শহরে নেই। বেশি সিঁদুর ব্যবহার করা উচিতও না। গ্রামে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেই মেটে সিঁদুরের মধ্যে লেড মেশানো থাকে, ওপর থেকে লেড পয়জনিং হওয়ার সম্ভাবনা। ওই জন্য গ্রামের অনেক সতীসাবিত্রী রমণীরই মাথার সামনের দিকে চুল উঠে যেতে শুরু করে তাড়াতাড়ি। অনেকের সিঁথি বিশ্রীভাবে চওড়া হয়ে যায়, নানারকম পেটের গোলমালও শুরু হয়।

কিন্তু দ্বারিক তো বীথিকে সিঁদুর পরতে বারনও করতে পারে না।

বীথি অত সিঁদুর পরত নিশ্চয়ই মাকে খুশি করার জন্য। হঠাৎ কি বীথি সেই অভ্যেস পালটালো? দ্বারিক ভালো করে বীথির মুখচ্ছবিটা মনশ্চক্ষে আনবার চেষ্টা করল, না, বীথির সিথিতে তো সে এখনও সিঁদুর দেখতে পাচ্ছে। দেখেছে আজও বেরোবার আগে। তা হলে কি বীথি আয়না কিনে নিজের ঘরে সিঁদুর পরে। আয়না কিনল কবে? বীথির সত্যিই একটা নিজস্ব আয়না কেনা দরকার। একথা দ্বারিকের বোঝা উচিত ছিল।

সারাদিন এই কথাটা ঘুরে-ফিরে অনেকবার মনে আসছিল দ্বারিকের। কিন্তু সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে আবার সে ভুলে গেল। ফের মনে পড়ল পরদিন সকালে। না, বীথির ঘরে কোনো আয়না নেই।

সকাল থেকে বীথির কতগুলো ধরাবাঁধা কাজ আছে।

ভুবন চা খেতে ভালোবাসেন, তাই সকাল বেলা দু-বার চা হয়। এটাই এ বাড়ির একমাত্র বিলাসিতা। এ গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িতেই চায়ের পাট নেই। চা তৈরির ভার বীথির। দ্বিতীয়বার চায়ের সঙ্গে বীথি প্রত্যেককে এক বাটি করে মুড়ি ও কাঁচা পেঁয়াজ দেয়। কোনো কোনো দিন পেঁয়াজকলি ভাজা। হালদার বাড়ির সারাদিনের খাদ্যে পেঁয়াজের খুব প্রাবল্য। বাড়ির পেছন দিকের কাঠাসাতেক জমি এতদিন আগাছায় ভরে থাকত। দ্বারিক সে-জায়গাটা সাফসুতরো করে পেঁয়াজ চাষ দিয়েছিল, বেশ ভালো ফলন হয়েছে। নতুন করে আবার লাগানো হয়েছে। বীথিই এখন পেঁয়াজ খেতের চর্চা করে। সে জল দেয়, মাটি নিড়োয়, আগাছা বাছে।

ভুবন হালদারের বাবা যা জমিজায়গা রেখে গিয়েছিলেন, ভুবন হালদার বিক্রি করতে করতে তা প্রায় ফতুর করে এনেছেন। অবশ্য নেশা-ভাং করেননি বা বেলেল্লাপনাও ছিল না, মানুষটি প্রকৃতিতেই অলস এবং বিষয়বুদ্ধিহীন। কিছু জমি গেছে মেয়ের বিয়েতে, আর কিছু গেছে দুই ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য। মোরামডাঙার মতন গ্রামের ক-টা লোক শহরের হোস্টেলে ছেলেদের রেখে লেখাপড়া শেখায়?

দ্বারিকের দিদির বিয়ে হয়েছিল বর্ধমানে। কিন্তু জামাইবাবু এখন জিয়োলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরি নিয়ে সপরিবারে থাকেন দেরাদুনে। বছর সাতেকের মধ্যে দিদি এ গ্রামে আসেনি। অ্যাবসকণ্ড করে থাকার সময় দ্বারিক জামাইবাবুর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই দ্বারিক আর দিদি-জামাইবাবুকে চিঠিও লেখে না।

এখন জমি আছে মাত্র এগারো বিঘে। ভাগচাষ দেওয়া আছে। জলের অভাবে এদিকে ধানের ফলন খুব কম। আই আর এইট-এর মতন বহুমুখী ধানের চারার কথা এদিককার চাষিরা জানে না, বছরে দু-তিনবার ফসল ওঠবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। বিঘেপ্রতি সাত-আট মন ধান হয় মাত্র, তাও যদি খরা না লাগে। বছরে সাত-আট মাসের মতন খোরাকির চাল ওই জমি থেকেই আসে। আর কোনো আয় নেই।

দ্বারিক পেঁয়াজের চাষ করে উৎসাহিত হয়ে কিছুদিন ধরে ভাবছে এবার সে বেগুন, আলু ইত্যাদি তরকারির চাষেও লাগবে। এ কাজে সে বীথিকেও নিযুক্ত রাখতে চায়। কারণ, সারাদিনে তার তত প্রায় কিছুই করার নেই। বীথি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে, অথচ তা কোনো কাজেই লাগবে না, এটা দ্বারিকের মনে হয় বিশ্রী অপচয়। স্কুলে পড়ানোর কাজ বীথিও করতে পারত দ্বারিকের মতন, কিন্তু আশেপাশে কোনো মেয়েদের স্কুল নেই। বাড়িসংলগ্ন জমিতে তরকারি চাষ করলে তবু কিছুটা সাশ্রয় হয়।

রান্নার কাজটা মা নিজের হাতেই রেখেছেন। বীথি নিতে চেয়েছিল, মা দেননি। রান্নাটাও ছেড়ে দিলে মা নিজেই বা সারাদিন করবেন কী? তা ছাড়া শুধু লাউয়ের খোসা আর আলুর খোসা মিলিয়ে যে সুস্বাদু হেঁচকি রাঁধা যায়, তা কি বীথি পারবে? বীথি চাল, ডাল ধুয়ে তরকারি কুটে মাকে খানিকটা সাহায্য করে, তারপর সরকার বাড়ির কুয়ো থেকে বালতি ভরে জল আনতে যায়। তার স্নানের জল। খাবার জলটা অবশ্য মা নিজেই আনেন পেতলের কলসিতে।

বীথি, তোমার কি জ্বর-টর হয়েছে?

দ্বারিকের রোদে শুকনো শার্ট আর গেঞ্জি রাখতে এসেছিল বীথি। ঘুরে তাকিয়ে বলল, কই না তো!

বীথি সত্যি কথা বলছে কিনা অথবা তার শরীরে জ্বর আছে কিনা এটা দেখার জন্য বীথির কপালে হাত দিয়ে দেখা দরকার। এ দায়িত্বটা দ্বারিক তার মাকেই দিতে চায়। কিন্তু

একটা মুশকিল এই, মা কোনো অসুখবিসুখের নাম শুনলেই চোখ কপালে তুলে ফেলেন। প্রত্যেক অসুখের পাশেই যেন মা দেখতে পান মৃত্যুদূত।

মাকে এ-রকম ব্যতিব্যস্ত করা বীথি নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না।

তোমার যদি শরীর-টরীর খারাপ হয় আমাকে বলবে। শুধু শুধু চেপে রাখলে পরে বেশি কষ্ট পেতে হবে তোমাকেই!

আমার শরীর একটুও খারাপ হয়নি। এখন খুব ভালো আছি। আমায় কিছু খারাপ

দেখছেন?

তিন-চারদিন ধরে তোমায় জল আনতে দেখিনি। তুমি স্নান করছ না?

এখন থেকে ভাবছি, পুকুরের জলেই স্নান করব।

কেন?

বীথি চাপাভাবে হাসল। যেন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। শুধু হাসিটাই যথেষ্ট।

শীতের শেষে পুকুরে জল বলতে প্রায় কিছুই নেই। এক হাঁটু জলের পরেই থকথকে কাদা। তাও শ্যাওলা সরিয়ে সরিয়ে নামতে হয়। বাসনপত্র ধুতে হয় ওই জলেই।

দ্বারিক আবার জিজ্ঞেস করল, কেন?

আপনারা ওখানে চান করতে পারেন, আমিই বা পারব না কেন? বিকেলের দিকে জলটা অনেকটা পরিষ্কার থাকে।

বীথি আবার হাসল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝিলিক খেলে গেল দ্বারিকের মাথায়। এবার সে বুঝতে পেরেছে বীথির হাসির মর্ম। মেয়েদের অকারণ হাসির মানে একটাই হয়, বীথি দ্বারিকের মন অন্য দিকে ফেরাতে চায়।

আমি একটু ঘুরে আসছি।

এখন কোথায় যাবেন? আপনি খেতে বসবেন না। আপনার স্কুলে যাওয়ার দেরি হয়ে যাবে।

দ্বারিক দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামাটা নিয়ে গায়ে পরতে পরতে বলল, সরকারবাড়ির কুয়ো থেকে তোমায় জল আনতে কেউ বারন করেছে?

না তো!

বীথি সচরাচর মিথ্যেকথা বলে না। আজ মিথ্যেকথা বলছে বলেই সেটা চাপা দেওয়ার জন্য হাসছে বারে বারে।

এখন শুধু শুধু কেন বেরোচ্ছেন?

আমাকে যেতেই হবে।

বীথি কোনোদিন যা করেনি, আজ তাই করল। এগিয়ে এসে দ্বারিকের হাত চেপে ধরে বলল, না, যাবেন না, আমি অনুরোধ করছি।

দ্বারিক কড়া গলায় বলল, আমার হাত ছাড়ো, বীথি।

ছোটোবাড়ি, এঘর থেকে ওঘরের কথা শোনা যায়। মা রান্নাঘরে, শুনতে পাননি কিছু, কিন্তু ভুবন এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে। তিনি দেখলেন তাঁর ছোটো-বউমা তাঁর বড়ছেলের হাত চেপে ধরেছে। ভুবন কোনো কথা বললেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন।

বীথি হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। হঠাৎ ভুবন এসে না পড়লে সে হয়তো দ্বারিককে আরও কিছু বলত।

দ্বারিক পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। বাইরে যেতে যেতে শুনল, ভুবন জিজ্ঞেস করছেন, অ বউমা, কোথায় গেল বড়োখোকা? রাগ করে গেল? তুমি তাকে কিছু বলেছ? অ বউমা...

বীথি অসহায়। সে তো আর ভুবনকে বলতে পারবে না, যান, আপনার ছেলেকে এক্ষুনি ফেরান, সে সত্যিই রাগ করে যাচ্ছে।

দ্বারিক হন হন করে এগিয়ে গেল সরকারদের কুয়োর কাছে।

সরকারদের বাড়িতে এখন বারো শরিক। তাদের মধ্যে নিত্য তিরিশ দিন ঝগড়া। এ পরিবারে সবচেয়ে সার্থক পুরুষ বিশ্বেশ্বর সরকার কিছু সম্পত্তি দেবত্র করে গিয়েছিলেন, শরিকি বিবাদে সেটা এখনও নষ্ট হয়নি। একটা শিবমন্দির, ছোটো একটি বাগান ও কয়েক বিঘে ধানজমি। আর এই কুয়ো। অনেকখানিক উঁচু করে গোল পাড়বাঁধানো, অনেকে এটিকে ইদারাও বলে। শীতকালেও জল থাকে। একটা পাথরের ট্যাবলেটে অনেক কথা লেখা ছিল, জলে ধুয়ে ধুয়ে মুছে গেছে, এখন আর প্রায় কিছুই পড়া যায় না।

এ গ্রামের মেয়েরা পুকুর পাড়ে গিয়ে বিশ্রম্ভালাপ করে না। মেয়েলি জটলার জায়গা এই কুয়োতলা। আশেপাশের অন্তত পঁচিশ-তিরিশখানা বাড়ির জল যায় এই বাড়ি থেকে।

জনা পাঁচেক মহিলা আজও উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। সবাই দ্বারিকের চেনা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলরবে মত্ত ছিলেন, দ্বারিককে দেখে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। এঁরা অনেকেই দ্বারিককে ছেলেবেলা থেকে দেখেছেন, সুতরাং তাঁকে ভাসুরঠাকুরের মতন সমীহ করার কোনো কারণ নেই। অস্বস্তিকর নীরবতা।

সরকারবাড়ির ছেলে বিষ্ণু কাঁধে গামছা ফেলে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে। শুধু ওবাড়ির পুরুষরাই এখানে স্নান সারতে আসে।

গল্প ভেঙে গেছে, রমণীরা একে একে বাড়ির পথ ধরলেন।

দ্বারিক একজনকে বলল, মণিপিসিমা, একটু জল খাব। একটু জল ঢেলে দেবেন?

মহিলা দ্বারিকের দিকে তাকালেনও না। আড়ষ্ট গলায় বললেন, বালতিতে আছে, ঢেলে নাও।

তারপর নিজের ঘড়াটা কাঁখে তুলে নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।

জল খেতে চাইলে কেউ এ-রকম ব্যবহার করে না গ্রামে। সকলেই নিজের ঘড়া থেকে জল ঢেলে দেয়। মণিপিসিমা বরাবর তাকে তুই বলতেন। দ্বারিক বুঝল গুরুতর কিছু গোলমাল হয়েছে।

দ্বারিক বালতি থেকে জল ঢেলে নিতে যেতেই বিষ্ণু বলল, আমি কিন্তু এখন চান করব!

দ্বারিক বলল, তুমি চান করবে...আমি একটু জল খেলে কি ক্ষতি আছে।

বিষ্ণু বলল, সে-কথা বলিনি। বলছি, তুমি যদি এখন চান করতে চাও, তাহলে একটু দাঁড়াতে হবে, আমি আগে সেরে নেব।

দ্বারিককে দেখেই বোঝা যায়, সে স্নান করতে আসেনি। বিষ্ণু ইচ্ছে করে তাকে খোঁচা মারছে।

বালতি থেকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলটুকু ঢেলে দ্বারিক মুখটা ধুয়ে নিল ভালো করে, কিছুটা খেয়েও নিল। তারপর হালকাভাবে বলল, তুমি বোসো, বিষ্ণুদা, আমি জল তুলে তোমার মাথায় ঢেলে দিচ্ছি।

কেন, তুমি আমার জল তুলে দিতে যাবে কেন?

এমনিই। বোসসা না।

না। নিজের জল আমি নিজেই তুলে নিতে পারি।

আরে বোসসা না। একদিন না হয় তুলেই দিলাম।

না।

দ্বারিক বালতিটা নীচে নামিয়ে দিল। অনেক দূরে জলের ওপর শব্দ হল ধপাস করে। দ্বারিক আবার বালতিটা টেনে তুলল।

বিষ্ণু এসে সেই বালতির জলটা ঢেলে ফেলল মাটিতে। এবার নিজে সে বালতি ফেলল। তার মুখখানা থমথমে।

বিষ্ণুদা, শোনো।

বিষ্ণু দ্বারিকের দিকে মুখ না ফিরিয়ে ঘাড় গোঁজ করে রইল।

আমাদের, ইয়ে মানে, ভুতোর স্ত্রী এখান থেকে জল নিতে আসত রোজ, তাকে কেউ জল নিতে বারন করেছে?

আমি কী জানি!

আর একজন মধ্যবয়সি মহিলা জল নিতে এসেছেন, পেতলের কলশিটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে একটা শব্দ হল।

বিষ্ণু সেইদিকে ফিরে বলল, ওই তো হেমীপিসিমা এসেছেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করো, উনি কিছু জানেন কিনা।

দ্বারিক জিজ্ঞেস করল, হেমীপিসি, আমাদের ভুতোর বউকে কেউ জল নিতে বারন করেছে এখান থেকে?

হেমীপিসির জিভের ধার বিখ্যাত। ঠিক এইসময় উনি এসে পড়ায় বিষ্ণু বেশ খুশিই হয়েছে। মনে হল।

হেমীপিসিমা বললেন, না বাবা, তাকে নিষেধ করবে এমন বুকের পাটা কার আছে?

দ্বারিক বক্রোক্তিটা গ্রাহ্য করল না। হাসিমুখে বলল, গত ছ-মাস, আট মাস ধরে সে এখান থেকে জল নিচ্ছে, কেউ কিছু বলেনি, হঠাৎ কী এমন হল? চার-পাঁচ দিন ধরে সে এখানে জল নিতে আসে না, কেউ কিছু তাকে বলেছে নিশ্চয়। আপনি কিছু শোনেননি।

না, আমি কিছু শুনিওনি, বলিওনি তাকে। আমি শুধু বলেছি, ও মেয়েটি জল নিলে আমাদের আর এখান থেকে জল নেওয়া হবে না। আমরা কষ্ট করে ভট্টাচার্য বাড়িতেই যাব। দূর হলে আর কী করা যাবে?

ও জল নিলে আপনারা নেবেন না? কেন? এতদিন নিয়েছেন—

বিষ্ণু এবার বলল, এতদিন তো লোকে জানেনি যে তোমরা শুদুরের ঘর থেকে বউ। এনেছ, তোমরা গোপন রেখেছিলে।

এটা গোপন রাখবার কী আছে?

গোপন রাখবার কিছু থাক-বা না থাক, খুলেও বলনি। ভুতোর সঙ্গে তার কেমন ধারা বিয়ে হল, তাও আমরা জানি না। ওসব কলকাতায় চলে, গাঁয়ে চলে না।

হেমীপিসিমা বললেন, নিজেরা যা করছ, তা করছ, কেউ তো বাগড়া দিতে যায়নি, তা

অন্যের জাতধর্ম্ম নিয়ে টানাটানি করা কেন আর?

দ্বারিক ঠাণ্ডাভাবে বলল, ভুতোর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে গভর্নমেন্টের লোকের সামনে, রীতিমতন সাক্ষী রেখে। সে-কাগজপত্রও আছে, যার খুশি হয়, দেখে আসতে পারে। হেমীপিসিমা, ওই মেয়েটি বি. এ. পাস, ওর বাবা ছিলেন একজন উকিল, তবু সে আপনাদের সঙ্গে এক কুয়ো থেকে জল নিতে পারবে না?

লেখাপড়া শিখলেই কি ছোটোজাত অমনি বড়ো জাত হয়ে যায়? কত ছছাটো জাতও তো আজকাল লেখাপড়া শিখছে...

বিষ্ণু এখনও স্নান শুরু করেনি, দাঁতনটা ঘষে যাচ্ছে একমনে। লোকটি এক নম্বরের মামলাবাজ। তা ছাড়া অন্য চরিত্রদোষও আছে।

দ্বারিক তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, শোনো বিষ্ণুদা, বিশ্বেশ্বর সরকার এই কুয়োটা তৈরি করেছিলেন সর্বসাধারণের জন্য। ওই পাথরের গায়ে সেকথা লেখা ছিল এক সময়, আমরা দেখেছি। সে-লেখা এখন মুছে গেলেও তোমার ঠাকুরদার কথাটা তো মিথ্যে হয়ে যাবে না!

বিষ্ণু বলল, আমার ঠাকুরদার আমলে কোনো বামুনের ঘরে মেয়েকে বউ করে আনা হলে তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত!

এখনও তোমাদের সেরকম ইচ্ছে আছে নাকি?

দ্বারিক, তুই আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছিস কেন? আমি তোর খাই না পরি?

আমি বলে গেলাম, ভুতোর বউ আবার এখান থেকে জল নিতে আসবে, দেখি, কে তাকে আটকায়!

আর কেউ জল নিতে আসবে না, সে একা নেবে?

যার খুশি নেবে, যার খুশি নেবে না। কারুকে বাধা দেওয়া চলবে না, এই বলে রাখলাম।

ওসব চোখরাঙানি আমাকে দেখাতে আসিসনি। আগেকার দিন আর নেই যে যখন-তখন যার-তার হাতে মাথা কাটবি।

হেমীপিসিমা বললেন, ও বাবা দ্বারিক, আমার ওপর রাগ করিস না, আমার ঘরে ছোটো ছেলেপুলে আছে, আমরা পুরোনো সেকেলে-মেকেলে লোক, আমরা আর জাত

খোওয়াতে পারব না... ভুতোর বউকে আমি মুখ ফুটে কিছু বলিনি..আমি বরং অন্য জায়গা থেকে জল নিতে যাব... বড়ো ভটচাজ বলেছিলেন...

বড়ো ভটচাজ অর্থাৎ গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই। সেদিন গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের কথাগুলোতে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে দ্বারিক ভুল করেছে। উনি ইচ্ছে করলে দারুণ শত্রুতা করতে পারেন।

রাগে দ্বারিকের শরীর জ্বলছে। এখন সে বুঝতে পারছে অনেক কিছু। গত তিন-চারদিন ধরে গ্রামের লোকেরা এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। কীরকম যেন আড়চোখে তাকাচ্ছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে খানিকটা ভয়। লোকে নরবলির সঙ্গে তার নামটা জড়িয়েছে। এই কুৎসার উৎস ওই গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই।

বাড়ি না ফিরে দ্বারিক এগিয়ে গেল সরকারবাড়ির দিকে। লীলাবউদির সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। এক্ষুনি।

বিটু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর দ্বারিক একবারও লীলাবউদির কাছে যায়নি। মাকে পাঠিয়েছিল দু-একবার। দ্বারিক কান্না সহ্য করতে পারে না, কান্না শুনলে সে শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করে। লোকে এটা বুঝবে না। বেশিরভাগ লোকই কান্না উপভোগ করে। একজন কাঁদে আর বহুলোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে গোল হয়ে। তারা দয়ালু, আর যে সেখানে যায় না, সে নিষ্ঠুর।

বিশ্বেশ্বর সরকারের দু-মহলা বাড়ি এখন যোলো টুকরো। খুব ছেলেবেলায় দ্বারিক এই বাড়ি গমগম করতে দেখেছে। আজ ভূতুড়ে বাড়ি মনে হয়। চতুর্দিকে ভাঙা ইটের স্তূপ। দেওয়ালের গায়ে বট-অশ্বথের মোটা শিকড়।

সদর দরজার কাঠের পাল্লা দুটোয় নানারকম কারুকার্য করা। বিশ্বেশ্বর সরকার নাকি শখ করে গুজরাট থেকে এই পাল্লা দুটো আনিয়েছিলেন। অযত্নে অবহেলায় সেই শিল্পকীর্তি এখন বিবর্ণ, ক্ষতবিক্ষত। এ দরজা কখনো বন্ধ হয় কিনা কে জানে।

ভেতরে একটা চৌকো উঠোন, তার তিনদিকে রক বাঁধানো। সেই রকে বসেছিল সুরেন। দ্বারিককে দেখে সে বিস্ময় লুকোবার চেষ্টাও করল না। স্পষ্টত হাঁ হয়ে গেল মুখখানা। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে চেয়ে দেখল, দ্বারিকের সঙ্গে দলবল রয়েছে কিনা। আর কেউ নেই দেখে সে যেন আরও বেশি অবাক।

দ্বারিক সুরেনের সঙ্গে কথা বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না। সবাই জানে, সে একটি অপদার্থ। এখানকার ভিলেজ ইডিয়েট-এর পদটা তাকে দেওয়া যায় অনায়াসে।

কোথায় যাচ্ছিস, দ্বারিক?

দ্বারিক কোনো উত্তর না দিয়ে রকের ওপর উঠে দুটো ঘরের মাঝখানের সরু জায়গাটা দিয়ে চলে এল দ্বিতীয় উঠোনটার দিকে। এই উঠোনেও তিন দিকে উঁচু রক, তার ওপর সার সার ঘর। দক্ষিণ দিকের কোণের একটিমাত্র ঘর লীলাবউদির।

ধীরেনদা মারা যাওয়ার পর লীলাবউদিকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। উনি বিদায় হলেই ধীরেনদার ভাগের ঘর আর জায়গাজমি অন্যদের দখলে আসতে পারে। বিষ্ণু তো মামলা বাধিয়ে জমিগুলো হাতাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে ওই হাবলা সুরেনটার উৎসাহও কম নয়।

লীলাবউদি।

দু-তিনবার ডেকেও দ্বারিক কোনো সাড়া পেল না। তারপর পুব দিকের একটি ঘর থেকে সাড়া এল, কে?

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন লতু কাকিমা। দ্বারিককে দেখে তিনি একটিও বাক্য ব্যয় না করে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে গিয়ে বেশ শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

দ্বারিক জেল থেকে ফেরবার পর এই লতু কাকিমা একদিন তাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন। ওঁর এক ভাই পুলিশে চাকরি করে। বীরভূমে পোস্টেড। গত কয়েক বছরের

হাঙ্গামায় সেই ভাইটি যে খুন হয়নি সেই কৃতজ্ঞতাতেই বুঝি তিনি নেমন্তন্ন করেছিলেন দ্বারিককে। আজ একটি কথাও বললেন না।

দ্বারিক রকের ওপর উঠে লীলাবউদির ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালো, খাটের ওপর দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে আছেন লীলাবউদি।

মায়ের কাছে দ্বারিক শুনেছিল যে বিটু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর প্রথম দু-তিন দিন লীলাবউদি ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে কোনো হুশ ছিল না। উনি নিজে তো কিছু খেতেনই না, ওঁর ছোটোমেয়েটার খাওয়ার ব্যবস্থার কথাও ওবাড়ির কেউ ভাবেনি। দ্বারিকের মা-ই সেদিন জোর করে উনুন ধরিয়ে ওদের জন্য রান্না চাপিয়েছিলেন।

দ্বারিক আজও দেখল, ঘরের দরজার পাশে একটা না-ধরানো উনুন পড়ে আছে।

দ্বারিক আবার জোরে লীলাবউদির নাম ধরে ডাকল!

লীলাবউদি পাশ ফিরে দ্বারিককে দেখে, যেন দারুণ ভয় পেয়ে, হুড়মুড় করে উঠে বসলেন।

দ্বারিকের বুক কাঁপছে। জীবনে কখনো সে এতটা অসহায় বোধ করেনি। সে কীভাবে কথা শুরু করবে? যে লীলাবউদি বাল্যকাল থেকে কত স্নেহ করেছেন দ্বারিককে, তিনি আজ তাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন? যদি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন? দ্বারিক কী করে ওঁকে বোঝাবে?

লীলাবউদি, আমি দ্বারিক।

লীলাবউদির বয়েস বছর পঁয়তিরিশ-ছত্রিশের বেশি না, কিন্তু যৌবনের কোনো চিহ্নই আর ওঁর শরীরে নেই। ভাগ্য-বিড়ম্বনায়, দুঃখে, দুশ্চিন্তায় এই রূপহীনা নারীর মুখখানা আরও অসুন্দর হয়ে গেছে।

উনি কাঁদলেন না বা চেঁচিয়ে উঠলেন না। দ্বারিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে খুব শান্ত গলায় বললেন, ও দ্বারিক, তুমি এসেছ? আমি ভাবলাম বুঝি কে না কে! বোসসা, এই খাটের ওপরেই বোসসা।

মিনু কোথায়?

কী জানি কোথায় গেছে! কোথায় কোথায় টোটো করে ঘোরে, কিন্তু আমি ওর জন্য চিন্তা করি না। মেয়েসন্তান তো, ওকে যমেও নেবে না।

লীলাবউদি, আমি...

তুমি বোসো দ্বারিক, ভালো হয়ে বোসো। তুমি এসেছ, তোমার সঙ্গে দুটো প্রাণখুলে কথা বলি। সেরকম মানুষ তো আর কেউ নেই এখানে!

ঘরটা বড়ো অন্ধকার হয়ে আছে, জানলা দুটো বন্ধ..খুলে দিই!

না ও জানলা খুললেই বড়দিদির রান্নাঘরের ধোঁয়া এসে ঢোকে।

আপনি এই অসময়ে শুয়ে আছেন...রান্নাবান্না করবেন না? এ-রকমভাবে চললে যে শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে!

শোনো দ্বারিক, কত লোক কত কথা বলে গেল, আমি বিশ্বাস করিনি। আমি জানি, তুমি এই গরিব বিধবার ছেলেকে মারবে না।

লীলাবউদি, আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

থাক থাক, পা ছুঁতে হবে না। আমি জানি। তুমি বামুনের ছেলে, আমার পা ছুঁলে যে পরকালেও আমার গতি হবে না। তুমি তোমার মায়ের সন্তান, তুমি আর একজন মায়ের সন্তানকে কক্ষনো কেড়ে নিতে পার না। তোমরা লেখাপড়া জানা ছেলে, দেশের কাজ

করতে গিয়েছিলে, তোমরা তো নিরীহ মানুষের ক্ষতি করতে চাওনি কখনো। তা ছাড়া, নরবলি দিলে মাটি থেকে জল বেরোবে, এটা একটা বাজে কথা নয়? বলো?

নিশ্চয়ই!

সেদিন ওরা আমাকে একটা কাটা মুণ্ডু দেখিয়েছিল, আমি জানি, ও আমার বিটু নয়..কিছুই নেই, নাক নেই, চোখ নেই, তবু আমি ঠিক বুঝেছি...নিজের সন্তান...দেখলে ঠিক চেনা যায়!

দূর থেকে লীলাবউদির কান্না আর বার বার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা শুনে দ্বারিক ভয়ে আসেনি। কিন্তু আজ সে দারুণ অবাক হয়ে গেল। লীলাবউদি সাধারণ স্ত্রীলোক নন, শোকের মধ্যেও তাঁর বিচারবুদ্ধি লোপ হয়ে যায়নি।

হয়তো বিটু বেঁচে নেই।

লীলাবউদি, আমি নিজে ওর খোঁজ করব...যে করে পারি...আজই আমি সদর থানায় যাব। মরেই গেছে বোধ হয়...অকালে কি ছেলে-মেয়েরা মরে না? পৃথিবীতে কি আমিই প্রথম মা এ-রকম পুত্রশোক কি আর কেউ পায়নি? এতদিনেও যখন কোনো খবর দিল না...আমাদের ছেড়ে নিজের ইচ্ছেয় চলে যাবে, সে তো এত স্বার্থপর ছেলে নয়। দ্বারিক, তুমি তাকে ফেল করিয়ে দিয়েছিলে?

আমি? আমি তো শুধু অঙ্কখাতা দেখেছি...অঙ্ক ছাড়া তো আর কিছু পড়াই না আমি।

বিটু অঙ্কেও ফেল করেছে।

খাতায় প্রায় কিছু লেখেইনি..কয়েকটা অঙ্ক কষার চেষ্টা করলেও তার ওপর তবু কিছু নম্বর দেওয়া যায়...কিন্তু খালি খাতায়...অবশ্য অঙ্কে ফেল করেও অনেকে প্রোমোশন পেয়েছে এবার।

পড়াশুনোয় ওর মাথা নেই...পাস করবে কী করে...কে দেখাবে অঙ্ক, কে ইংরেজি পড়াবে...আমার যেটুকু বিদ্যে ছিল, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম, আর পারি না..আশা করেছিলাম ওই ছেলে লেখাপড়া শিখে দাঁড়াবে, তারপর আমরা এবাড়ি ছেড়ে চলে যাব..কিন্তু কিছুই হল না, আমাদের ফেলে রেখে ও চলে গেল।

ও কেন চলে গেল, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না...এত শান্তশিষ্ট ছেলে–

বড়ো অভিমানী...যাদের অভিমান বেশি থাকে, তারা বেশিদিন বাঁচে না! এবাড়ির লোকেরা যখন আমাদের গালমন্দ করত, যা নয় তাই বলত...বিষ্ণু একদিন আমায় বলেছিল, এ মাগিটার রাক্ষুসির মতন চেহারা...বাড়িতে থাকলেই অমঙ্গল..তখন আমার ছেলে দৌড়ে এসে আমার কান চাপা দিয়ে বলত, মা তুমি ওসব কথা শুনো না...আর খুব কাঁদত। রাত্তিরে আমার পাশে শুয়ে বলত, মা, আমি একটু বড়ো হই, তারপর আমি চাকরি করব তোমাকে আর মিনুকে এখান থেকে নিয়ে যাব, অনেকদূরে এ গাঁয়ে আর আমরা কক্ষনো ফিরব না মা, তখন আর তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না...

লীলাবউদির মুখে একটা হিক্কার শব্দ উঠল। এইবার বোধ হয় কান্না শুরু হবে। দ্বারিক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ঘরটায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ। জানলা দুটো বোধ হয় কোনো সময়ই ভোলা হয় না। একটা কেমন দমচাপা ভাব।

কিন্তু লীলাবউদি কাঁদলেন না। চোখ বুজে রইলেন খানিকক্ষণ। সেই অবস্থায় থেকেই বললেন, সবাইকে নিয়তি মেনে নিতেই হয়, জানি, তবু মন মানে না...যখনই মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

দ্বারিক খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, আমার যতদূর সাধ্য, আমি যেকোনো উপায়ে বিটুর একটা খোঁজ বার করবই...একটা চোদ্দো বছরের ছেলে তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না...

লীলাবউদি চোখ খুললেন না।

আমি এখন যাই! আপনি উঠুন, রান্নাবান্নার কিছু ব্যবস্থা করুন। ঘরে চাল আছে? দ্বারিক, তোমার মা এসে সেদিন আমার বললেন, বউ, ভেবে দেখ তো সেইসব দিনের কথা, যখন আমার দুটো ছেলেই নিরুদ্দেশ...পুলিশ এসে যখন-তখন বাড়ি তছনছ করছে...আমি তাও তো সহ্য করে বেঁচে থেকেছি...তোমার মা সত্যি অনেক কষ্ট পেয়েছেন...কিন্তু তাঁর এক ছেলে ফিরে এসেছে, আর এক ছেলেও ফিরবে...কিন্তু আমার বিটু আর ফিরবে না।

চোখ খুলে লীলাবউদি আবার বললেন, আমি জানি, বিটু আর ফিরবে না!

নিশ্চয়ই ফিরবে, একথা দ্বারিক যতজোর দিয়ে বলতে চেয়েছিল, ততখানি জোর গলায় ফুটল না। মায়ের কাছে তার সন্তান সম্পর্কে মিথ্যে স্তোকবাক্য উচ্চারণ করা সহজ নয়। দ্বারিকের পিঠের ওপরে যেন একটা পাষাণ ভার।

সে নিজের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দেখছি।

৭. অমাবস্যার রাত্রে চলাফেরা

অমাবস্যার রাত্রে চলাফেরা করতে গেলে সঙ্গে টর্চ না রেখে উপায় নেই। নেহাত দরকার না থাকলে বিশেষ কেউ বেরোয়ও না।

তেঁতুলিয়া মোড়ের দিক থেকে একটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছে এবাড়ির দিকে। আলোটা এদিক-ওদিক ঘুরছে। কোনো চঞ্চল হাত ধরে আছে সেই টর্চ।

দ্বারিকের শোবার ঘরের জানলা দিয়ে ঠিক তার মুখের ওপর এসে পড়ল সেই টর্চের আলো।

দাদা!

দ্বারিক লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে।

ভুতো! তুই এসেছিস!

অন্ধকারের মধ্যে দরজা খুলতে গিয়ে দ্বারিক গুঁতো খেল দু-বার। তারপর দেখল, দরজা খোলাই ছিল। এমনকী সদর দরজাও বন্ধ করা হয়নি। জুতো দপদপিয়ে ভুতো ঢুকে এল তার ঘরের মধ্যে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এর মধ্যেই?

এক্ষুনি ডাকছি, মা, মা-

ভুতো হাত তুলে বলল, দাঁড়া, এখন ডাকতে হবে না। তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? বোস।

তুই এতরাত্রে কী করে এলি? এখন তো কোনো বাস নেই! জানিস, বীথি এসেছে।

আমি মল্লিকপুকুর থেকে হেঁটে এলাম। রবির সঙ্গে দেখা করে এলাম, তাই দেরি হল। তোদের খবর কী?

ভালো! জানিস, বীথি এসেছে। এখানেই আছে!

জানি।

দ্বারিক ভুতের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তার মুখে ও শরীরে আলো ফেলল। ভুতোর মুখ ভরতি দাড়ি, চোখে একটা কালো চশমা। এই অন্ধকারে ও চশমা পরে আছে কেন? একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি আর পা-জামা পরা, বোম-খোলা, চওড়া বুকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভুতোর স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়েছে।

দ্বারিক ভুতোর কাঁধে হাত রাখল। অতিরিক্ত আবেগে তার নিজের শরীর কাঁপছে। কী কথা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

চশমাটা খোল! তোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।

ভুতোর এক চোখ কানা। আর একটা চোখ যেন বেশি জ্বলজ্বল করছে।

এ কী! তোর চোখ।

তুই খবর পাসনি? এ তো মাস ছয়েক আগেই, আগুনের হলকা লেগেছিল...দুটো চোখ যে যায়নি, তাই যথেষ্ট।

ভুতো তোর একটা চোখ নেই...মা দেখলে...ইস বীথি যখন দেখবে...আমিই তোর দিকে। তাকাতে পারছি না।

তুই কী ছেলেমানুষি করছিস, দাদা! বললাম তো একটা চোখ যে আছে, তাই তো যথেষ্ট, আমার কোনো অসুবিধে হয় না..মানুষের অনেক জিনিসই বেশি বেশি থাকে, দুটো কিডনি, দুটো লাঙস, দুটো কান, দুটো চোখ—এর একটা দিয়েও বেশ কাজ চালানো যায়।

কী করে হল?

আগুনের হলকা লেগে...সেসব পরে বলব।

তোর কথা মাকে বলতে পারছিলাম না, আমি ভেবেছিলাম, মাঝে আমি শুনেছিলাম–

এখন তো আমি এসে গেছি, আর কোনো চিন্তা নেই এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভুতো, আমি একা একা আর পারছিলাম না, এরকম সমস্যা...আমি এত কিছু সামলাতে পারি না..দাঁড়া বীথিকে ডাকি, মাকে ডাকি–

এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে! ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক না।

তুই এখন থাকবি তো? আর চলে যাবি না তো!

না, যাব না, এখন ক-দিন ভালো করে খাব-দাব, আর টেনে ঘুমোব।

কেন এতদিন পালিয়েছিলি, কোনো দরকার ছিল না, এখন তো সবাইকে জেল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে, সবাই ফিরে আসছে।

সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছে? কে বলল তোকে?

ছেড়েই তো দিচ্ছে, আস্তে আস্তে, অন্য স্টেটে কেসের ঝামেলাগুলো মিটে গেলে–

তুই ছাই জানিস! এখনও এত হাজার হাজার ছেলেকে যে ছাড়ছে না বা ছাড়বেও না, সে খবর রাখিস? অনেকের ঘাড়ে মিথ্যে মিথ্যে ক্রিমিনাল কেস চাপিয়ে দিয়েছে, তারা আর পলিটিক্যাল প্রিজনার নয়, তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

কলকাতা থেকে রবীন আমাকে চিঠি লিখেছে...ওরা একটা গণ কমিটি করে জেলে জেলে ঘুরে তালিকা তৈরি করছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তালিকা সাবমিট করে।

ভুতো হাসল। সে এখনো বসেনি। তার শরীরে যেন একটা ছটফটে ভাব। তার হাসিটা নিষ্ঠুর ধরনের।

সেই আবেদন-নিবেদনের রাস্তা! মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, খবরের কাগজে বিবৃতি ছাপিয়ে আবেদন, আবার সব কেঁচে গন্ডুষ। হে:! তোর কাছে সিগারেট আছে, দে একটা সিগারেট দে।

দেখো, ওই বইয়ের র‍্যাকে। তুই তো আগে সিগারেট খেতিস না ভুতো। দে

শলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে সেই আলোয় ভুতো হ্যারিকেনটা দেখতে পেল। সেটা ধরিয়ে খাটের পাশের টুলটার ওপর রেখে সে দাঁড়াল জানলায় পিঠ দিয়ে। পাঞ্জা খোলা ডান হাতখানা সে আড়াআড়ি ভাবে রাখল বাঁ-বুকে, দু-তিনবার চাপড় মেরে সে বলল, আমি স্বদেশ হালদার, আমি কখনো ধরা দিইনি, পুলিশ আমার একটা চুলও ছুঁতে পারেনি, কোনো শুয়োরের বাচ্চা আমার গায়ে হাত তুলতে পারেনি এ পর্যন্ত! ওই সব আবেদন-নিবেদন আমি গ্রাহ্য করি না। আমি বিশ্বাস করি, জেলখানা ভেঙে ওদের বাইরে নিয়ে আসা উচিত।

দ্বারিক মন দিয়ে শুনল না ভুতোর কথা। সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বীথির সন্তান যে বাঁচেনি, সে খবর কি ভুত জানে? হয়তো সে নিজের সন্তানকে দেখবে বলেই হঠাৎ আজ ফিরে এসেছে। লজ্জায় সে-কথা বলতে পারছে না।

ভুতো যেন মনের ভাষা পড়ে নিতে শিখেছে। হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রসঙ্গ পালটে সে বলল, বীথিকে দেখে তোরা খুব অবাক হয়ে যাসনি? জাত-ফাতের কথা তুলে মা কোনো ঝামেলা করেনি তো?

না, না, মা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছে, বীথি খুব ভালো মেয়ে।

...কিন্তু তুই বিয়ের সময় কোনো খবর দিলি না..মাকে অন্তত একটা চিঠি লিখলে পারতিস।

ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানিস? তুই মানিকবাবুর হারাণের নাত জামাই গল্পটা পড়েছিস? অনেকটা সেইরকম! হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ায় আমি আর কোনো উপায় না দেখে বীথির বিছানায় ওর কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লুম, বীথির বাবাও বেমালুম বলে দিলেন আমি ওঁর জামাই, তখন আমার দাড়ি ছিল না...সে গবেটটা আমায় চিনতে পারেনি...আমি যদি আর দু মিনিটও সময় পেতাম...যাই হোক, বীথির বাবা একবার যখন বলে ফেললেন, তখন আমি ভাবলাম, বিয়েটাই করে ফেলা যাক।

বীথি খুব চমৎকার মেয়ে, আমাদের বাড়ির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে।

জানিস দাদা, আমার মনে হয়, আমার বদলে অন্য কারুর বিয়ে করা উচিত ছিল বীথিকে। ধর, তোর মতন কোনো ঠাণ্ডা মাথার ভালো ছেলেরই উচিত ছিল বীথিকে বিয়ে করা।

যাঃ কী পাগলের মতন কথা বলছিস!

হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে মানাতো বেশি, আমার মতন ছেলেদের বিয়ে করা উচিত নয়, এটা আমি পরে বুঝতে পেরেছি। আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তুই তা হলে বীথিকে...

ভুতো, তুই এবার মার খাবি আমার কাছে। দাদা, তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে...

আমি মনের দিক থেকেও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছি...এতরকম ঝঞ্ঝাট এক-এক সময় মনে হয় জেলের মধ্যেই ভালো ছিলাম।

ধুৎ এবার আমি এসে পড়েছি, আর কোনো চিন্তা নেই। আমি সব ঠিক করে দেব..আমি আবার দল গড়ব, সবাইকে মিলিয়ে একসঙ্গে...নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে...আসবার পথে আমি রবির সঙ্গে কথা বলে এসেছি।

দ্বারিক চিৎকার করে বলল, রবিকে তুই বিশ্বাস করিস না। রবি তোর নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছে চারদিকে..ও একটা রেনিগেড।

ভুতো হা-হা করে হেসে উঠল। দাদার তুলনায় সে অনেক বেশি বলিষ্ঠ, অসম্ভব তার মনের জোর, কোনো বাধাই সে গ্রাহ্য করে না।

ভুতো ডান পকেটে হাত দিল রুমাল বার করবার জন্য। একসঙ্গে বেরিয়ে এল আট দশটা রুমাল। হাসতে হাসতে সে বাঁ-পকেটে হাত দিয়ে আবার দশ-বারোটা বার করে আনল। সিল্ক বা রেশমের রুমাল, নানান ঝলমলে রঙের। তার দু-পকেট উপচে আরও অসংখ্য রুমাল বেরিয়ে আসছে। ঠিক ম্যাজিশিয়ানদের মতন। ভুতো দু-হাতে রুমালগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করল, তুই বলনা, তোর আর কী চাই?

দ্বারিক ভাবল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? সে চোখ মেলে তাকাল। না, স্বপ্ন নয় তো, ওই তো জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুতো, ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়।

দ্বারিক এরপর দ্বিতীয় স্বপ্নটা দেখতে শুরু করল।

ভুতো, আমি ভাবছিলাম, আমি স্বপ্ন দেখছি—তুই আসিসনি...তুই এতদিন দেরি করলি?

আমি সময় নিচ্ছিলাম...আমি আগে এলে, তুই জানিস না, ওরা ঠিক আমায় ধরে তিন চারটে ফলস মার্ডার কেসে ঝুলিয়ে দিত...জানিস না অনেকের নামে ডাকাতি, রেপ চার্জ পর্যন্ত দিয়েছে।

মা, মা, মা।

সবাইকে জাগিয়ে তুলছিস কেন? বাবার কী খবর?

তুই হঠাৎ বাবার সামনে যাসনি...বাবা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। তোকে হঠাৎ দেখলে কী যে করবেন...ভালোও হয়ে যেতে পারেন, বেড়েও যেতে পারে।

আমি এসে পড়েছি, আমি সব ঠিক করে দেব।

ভুতো, তুই চশমাটা পরে নে...মা প্রথমেই যখন দেখবে তোর একটা চোখ...

মা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটা বাটি। একটুও অবাক হননি মা, যুবতী মেয়ের মতন ঠোঁট টিপে হাসছেন।

মা বললেন, আমি ঠিক জানতাম আজই ভুতো আসবে। আজ ভুতোর জন্মদিন—আমি মুগের ডাল তৈরি করে রেখেছিলাম।

ভুতো ব্যগ্রভাবে বলল, মুগের ডাল? কই দাও, দাও? কতদিন খাইনি।

মায়ের হাত থেকে বাটিটা নিয়ে ভুত এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিল। তারপর আঙুল দিয়ে বাটিটা মুছে মুছে মুখে দিতে লাগল খুব তৃপ্তির সঙ্গে।

কী চমৎকার দৃশ্য। দ্বারিকের মন ভরে গেল। ভুতো না থাকলে এই বাড়িটাই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, লীলাবউদি ঠিকই বলেছিল, তোমার দুই ছেলেই ফিরে আসবে।

ভুতো জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটি কে?

বীথি ঘরে ঢুকে এসেছে। তার দু-চোখে ঘুম জড়ানো। দ্বারিক এবং মা একসঙ্গেই বললেন, এই তো বীথি!

ভুতো বলল, যাঃ, এ কেন বীথি হবে? বীথিকে আমি চিনি না?

দ্বারিক বলল, এ বীথি নয়? তুই কী বলছিস রে?

মা বললেন, আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, এ ভুতোর বউ হতে পারে না।

ভূতো বলল, বীথি তো এত লম্বা নয়, আরও রোগা ছোট্টখাট্টো চেহারা, গায়ের রং-ও আরও ময়লা।

বীথি কোনো কথা বলছে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভুতোর দিকে।

মা বললেন, এই মেয়েটি এসে তোর পরিচয় দিয়ে থাকতে চাইল আমাদের এখানে...আমি তখনই দ্বারিককে বলেছিলাম।

দ্বারিক বলল, মা, তুমি ভুল করছ। বীথি কখনো মিথ্যেকথা বলে না!

মা বললেন, ভুতোর বউকে ভুতো নিজে চিনতে পারবে না? আমারও মন বলছিল...কালই বাপু এ মেয়েকে অন্য কোথাও রেখে আয়। একেই তো সারাগাঁয়ে নানারকম কথা উঠেছে।

ভুতো বলল, দাদা, তুই এ কোন মেয়েকে এনে বাড়িতে রেখেছিস? এ-রকম একটা সুন্দরী মেয়ে

বীথি এবার তীব্রভাবে এক ধরনের উপহাসের হাসি হাসল ভুতোর দিকে চেয়ে।

দ্বারিকের দারুণ অস্বস্তি লাগছে, বুকের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসার মতন। ভুতো বলছিল, ও সব ঠিক করে দেবে। কিন্তু ও আসামাত্রই তো আর একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে উঠল। এতদিন সকলের কাছে যাকে ভুতোর স্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল দ্বারিকের। ডুবন্ত মানুষ যেন পেয়ে গেল একটা ভাসমান কাঠ। উত্তেজিতভাবে সে বলল, তোর বন্ধু আশিস আর মলয়..ওরা এসেছিল, ওরা বীথিকে চেনে, তোর বউ হিসেবে, ওর ডেলিভারির সময়...

মা বললেন, মেয়েটি আবার এসেছিল পোয়াতি অবস্থায়।

শব্দ হওয়ার কথা নয়, তবু যেন ফট করে একটা শব্দ হল, আর ভুতোর বন্ধ চোখটা খুলে গেল। সে তা হলে কানা হয়নি, ইচ্ছে করে বুজে ছিল এক চোখ।

দ্বারিকের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে সে বলল, শোন দাদা, তোর নিশ্চয়ই কোনো মাথার গোলমাল হয়েছে...আমি বলছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম, সেই বীথি মারা গেছে আজ থেকে ঠিক আট মাস আগে...আমি তখন অ্যাবসকণ্ড করে থাকলেও ঠিক হাজির হয়েছিলাম শ্মশানে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমি তার ডেডবডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বলেই আমার চোখে আগুনের ঝলসা লাগে, বেশিক্ষণ খুলে রাখতে পারি না চোখটা।

দ্বারিক চেঁচিয়ে উঠল, আমি আর নিশ্বাস নিতে পারছি না আমার বুকে কষ্ট হচ্ছে, মা, একটু জল, শিগগির শিগগির...মরে গেলাম মরে গেলাম...

দ্বারিক আবার চোখ মেলল। মুখ-চোখ একেবারে ভেজা। সে ভাবল, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। শরীর আবার সুস্থ লাগছে।

মা আর বীথি বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ভুত একা রয়েছে তার পাশে। ভুতোর কাঁধে ঝোলানো মস্তবড়ো ব্যাগটা দ্বারিক আগে লক্ষ করেনি।

ভুতো ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই ঠং করে শব্দ হল।

দ্বারিক জিজ্ঞেস করল, ওর মধ্যে কী আছে রে?

দেখবি?

ভুতো দুটো ঝকঝকে নতুন রিভলবার বার করল সেই ব্যাগ খুলে।

এ কী, তুই এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস? আবার যদি বাড়ি সার্চ হয়! এখন এসব লুকিয়ে ফেলাই ভালো। রবি বলছিল, তুই নাকি আর্মস বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিলি...

রবিটা একটা পাঁঠা। আরও কী কী এনেছি, দেখবি? এই দেখ, এক ডজন ডিনামাইট স্টিক... তিন-শো রাউণ্ড গুলি... হ্যাণ্ড গ্রেনেড...

তুই এসব কেন এনেছিস, ভুতো? এসব দিয়ে এখন কী হবে?

তুই ভয় পেয়ে গেলি নাকি, দাদা? আরও দেখবি? আমার কাছে একটা ডিসম্যানটল করা এল এম জি আছে... বাংলাদেশে থেকে জোগাড় করে এনেছি, এক্ষুনি ফিট করতে পারি।

সাংঘাতিক কান্ড করেছিস। এসব আজই পুঁতে ফেলতে হবে মাটির নীচে।

--কক্ষনো না! আমি দল গড়ব আবার। চটপট কাজ শুরু করে দিতে হবে, এবার প্রথম থেকেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন, আমরা ব্রিজ উড়িয়ে দেব, রেললাইন উপড়ে ফেলব, শ্রেণিশত্রুদের কোনোক্রমেই ক্ষমা করব না...অবিনাশদাদের দল যদি বাধা দিতে আসে একেবারে খতম করে দেব।

না, না! ভুতো তুই ভুল করছিস...আগে দরকার জনসংযোগ...সাধারণ মানুষদের বোঝাতে হবে..সাধারণ মানুষ এখনও...আমাদের দেশে খুনোখুনি পছন্দ করে না,– কতরকম সংস্কার...ওদের বাদ দিয়ে এগোনো যাবে না...ওদের সঙ্গে নিতে হবে।

তুই কিচ্ছু বুঝিস না...সারাদেশ এখন আগ্নেয়গিরির মতন ফুটছে, এখন দরকার বড়োরকমের একটা আঘাত...আমাদের এই মোরামডাঙা থেকেই শুরু হবে লং মার্চ...তুই শুয়ে আছিস কেন? ওঠ, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

তুই কি পাগল হয়েছিস ভুতো? বোস চুপ করে, কথা বলি আগে।

ভুতো দু-হাত দিয়ে দ্বারিকের ক্ষীণ শরীরটা টেনে তুলল বিছানা থেকে। হিংস্র গলায় বলল তুই ভয়ে পেছিয়ে যেতে চাস? তাহলে থাক তুই, আমি একাই চললাম।

না, না, ভুতো, যাসনি, দাঁড়া ভুতো, মা মা ওঃ ওঃ।

মা ছুটে এসেছেন ঘুম ভেঙে। শেষরাতের ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দ্বারিকের বিছানায়। দ্বারিক দৃষ্টিহীনের মতো চোখ মেলে আছে।

মা বললেন, কী হয়েছে? ভয় পেয়েছিস? এই দ্বারিক, কথা বলছিস না কেন? কী

হয়েছে?

মায়ের মুখটা ভালো করে দেখা যায় না। বুকের ওপর মায়ের স্পর্শ অনুভব করে দ্বারিক খানিকটা ধাতস্থ হল। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল তা হলে। কিন্তু হ্যারিকেন জ্বালা হয়নি। ভুতো আসেনি। আসবেই বা কী করে?

মা বললেন, বুকের ওপর হাত রেখে শুয়েছিলি, কতদিন বারন করেছি, ওরকমভাবে শুলে ওলায় ধরে। পাশ ফিরে শো। জল খাবি? খুব ভয় পেয়েছিলি বুঝি?

দ্বারিক ক্লান্তভাবে নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, মা, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোনো মানে হয় না অবশ্য–।

৮. ডিপটিউব-ওয়েল থেকে সত্যি জল বেরিয়েছে

ডিপটিউব-ওয়েল থেকে সত্যি জল বেরিয়েছে। এখন নালি কাটার কাজ চলছে। সরু সরু নালিগুলো যাবে প্রত্যেকের জমির পাশ দিয়ে, প্রয়োজনের সময় এখান দিয়ে জল যাবে।

দ্বারিক গিয়েছিল জায়গাটা দেখতে। গ্রামের কিছু লোক এখানে সবসময়ই ভিড় করে। থাকে। এটাও ঠিক, এই ডিপটিউবওয়েল বসানো এই গ্রামের পক্ষে একটি বৃহৎ ঘটনা।

যদিও দ্বারিক জানে, এতে লাভ হবে বড়ো বড়ো চাষি আর মহাজনদেরই। জল কিনতে হবে পয়সা দিয়ে। পাম্প চলবে ডিজেল বা পেট্রোলে, একজন লোক রাখতে হবে পাম্প চালাবার জন্য। সরকারের খরচ আছে। সরকার বিনা পয়সায় জল দেবে না। ভাগচাষিদের খরচ বাড়বে। সে পয়সা আগে তুলে নেবে জমির মালিক।

তবু ফসলের পরিমাণ বাড়বে। অনেকেই বলাবলি করছে যে, এ তল্লাটের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবার। এই হারে যদি উন্নতি হয়, তাহলে মালোপাড়ার লোকগুলোর সারাবছর প্রত্যেকদিন দু-বেলা পেট ভরে খাওয়ার মতন অবস্থা আসতে নিশ্চয়ই লেগে যাবে আরও এক-শো বছর।

দ্বারিক কারুকে ডেকে কথা বলতে পারছে না। চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্যরা। অথবা দূরে যাচ্ছে। কোনো একটা জায়গায় গেলেই বোঝা যায়, সেখানকার লোকরা তাকে পছন্দ করছে কী করছে না। কয়েকদিন থেকে এ-রকম শুরু হয়েছে। অথচ, জেল থেকে ফেরার পর অনেকেই সাগ্রহে তার কাছে গল্প শুনতে আসত। এখন তারা দ্বারিককে ভয় পাচ্ছে? নাকি, বেশি ভয় পেত তখনই।

এক জায়গায় দ্বারিক থমকে গেল। একটা তীব্র বিরক্তি পাক খেয়ে গেল তার শরীরে। খানিকটা জায়গা ছোটো ছোটো পাথরের নুড়ি দিয়ে গোল করে ঘেরা। মাঝখানে একটা বড়োপাথর। তার গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা, কাজলচন্দ্র সরকারের স্মৃতিতে।

দ্বারিক জানে, লীলাবউদির ছেলে বিটুর ভালো নাম কাজল।

সে মুখ তুলে দেখল, খানিকটা দূরে দশ-বারো জন লাইন করে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে তার দিকে।

দ্বারিক খানিকটা ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

দ্বারিকের ইচ্ছে করল, লাথি মেরে সব জিনিসটা ভেঙে দেয়। পরীক্ষায় ফেল করে একটা ছেলে পালিয়ে গেছে, তার সম্পর্কে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া হল না। তার আগেই গ্রামের লোক ছেলেটাকে শহিদ বানিয়ে দিচ্ছে। ওর মা জানতে পারলে কতখানি আঘাত পাবেন! এদের এইসব ব্যাপারে কোনো বোধই নেই। একটু হুজুগ পেলেই হল!

পেছন ফিরে দ্বারিক জোরে জোরে হাঁটতে লাগল আর অমনি হো-ও-ও-করে একটা ব্যঙ্গের হাসির আওয়াজ ভেসে এল লোকগুলোর দিক থেকে। একজন চেঁচিয়ে বলল, এঃ আবার খিটকেলমি দেখো না। জিজ্ঞেস করছে, এটা কী? জানে না যেন।

দ্বারিক ফিরে দাঁড়াল। সে ওদের কাছে যাবে? ঝগড়া করবে? তার খুব রাগ এসে যাচ্ছে। এখন সে বুঝিয়ে কথা বলতে পারবে না।

সে চেঁচিয়ে বলল, এই ব্রজেন। এই সুখরঞ্জন, আমি কী খিটকেলমি করলাম?

তোমার সঙ্গে কে কথা বলেছে? আমরা তো তোমাকে কিছু বলিনি!

ঠিক যেন ছেলেমানুষের ঝগড়া। যে লোকটা রিগ চালায়, সে একটা ইটের পাঁজার ওপর বসে বিড়ি টানতে টানতে মজা দেখছে। দ্বারিক বুঝল, এখানে এখন কথা বলার কোনো মানে হয় না।

সে আবার হাঁটতে শুরু করতেই আর একটি মন্তব্য ভেসে এল, ন্যাকাচৈতন! আমরা বাপের জন্মে এতখানি ন্যাকা সাজতে শিখিনি!

দ্বারিক মনে মনে বলল, মাথা গরম করলে চলবে না। বোকাদের ওপর রাগ করে লাভ নেই। পরে ধীরেসুস্থে ওদের বোঝাতে হবে।

গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই প্রচার কাজটা ভালোভাবেই চালাতে পেরেছেন তা হলে। ওঁর কেন এত রাগ আমার ওপর, দ্বারিক ভাবল? এটা বুঝে ওঠা খুব শক্ত। দ্বারিক গোষ্ঠজ্যাঠামশাইকে কখনো অসম্মান দেখায়নি, তবু তিনি দ্বারিককে গ্রাম ছাড়া করতে চান। দ্বারিক বরং ধরেই নিয়েছিল যে মহাদেব সাহা কোনো-না-কোনোভাবে তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে। মহাদেব সাহার কাকা খুন হয়েছিল। সে ব্যাপারে দ্বারিকের কোনো হাতই ছিল না। সে তখন দমদম সেন্ট্রাল জেলে। কিন্তু এটা যেহেতু তাদের পার্টিরই কাজ, সেইজন্যই সে পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে এখন দ্বারিককে ওরা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

মহাদেব সাহা কিন্তু প্রকাশ্যে সেরকম কোনো ভাবই দেখায় না। দ্বারিকের সঙ্গে দেখা হলেই একগাল হেসে খুব খাতির করে কথাবার্তা বলে। গতকালও দেখা হয়েছিল, অন্যদের মতন মহাদেব সাহা মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, বরং বলেছিল, আমাদের বাড়িতে একবার এসো না? দ্বারিক যায়নি অবশ্য। বাইরে হাসিমুখে থাকলেও মহাদেব সাহা হয়তো ছুরি শানাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এইসব লোককে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না দ্বারিক, অন্য মানুষদের শোষণ করাই যাদের জীবিকা, অথচ তাদের মুখে সবসময় একটা উদার, দয়ালু দয়ালু ভাব মাখানো থাকে। কাকার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মহাদেব সাহা যে ঠিক কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে, তা দ্বারিক এখনও বুঝতে পারে না।

অথবা, এমনও হতে পারে, ওর কাকার মৃত্যুতে মহাদেব সাহা খুশিই হয়েছে। পরোক্ষভাবে মহাদেব সাহাকে সাহায্য করেছে দ্বারিকের দল। কাকার সম্পত্তি মহাদেব সাহাই আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সেইজন্যই সে দ্বারিককে দেখে হাসে? মহাদেব সাহাকে বাঁচতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল।

মহাদেব আর গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের স্বার্থ এক নয়। অন্যের জমিজায়গা দখল করার দিকে ঝোঁক নেই গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের। তিনি চান নৈতিক প্রভুত্ব। তাঁর কাছে পাপ-পুণ্যের নিরিখ শুধু ধর্মীয় সংস্কার। উনি চান সে-ব্যাপারে সবাই ওঁর নির্দেশ মেনে চলবে।

গ্রামের মানুষরা যে দ্বারিককে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এর একটা প্রতিবিধান শিগগিরই করতে হবে তাকে। এটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এ গ্রামে সে একা পড়ে গেছে। কিন্তু সকলকে আবার বোঝানো দরকার যে সে একা নয়, মল্লিকপুরের ছেলেদের নিয়ে আবার দল গড়তে হবে।

স্কুলে গিয়েও দ্বারিককে একই অবস্থার মুখোমুখি হতে হল। ছেলেরা তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। অন্য মাস্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে তাকে দেখে।

হেডমাস্টার নিশীথ কর্মকার দ্বারিককে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। ইনি বহু পুরোনো লোক, দ্বারিকও একসময় এঁর কাছে পড়েছে।

সেসময় স্কুলবাড়িটা ছিল কাঁচা, মাটির ভিত আর দরমার বেড়া। পেনসিল দিয়ে বড়ো ফুটো করা ছিল দ্বারিকের প্রিয় দুষ্টুমি। এই পাঁচ-ছ বছর আগে পাকাবাড়ি হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে নানা ধরে গেছে দেওয়ালে। বৃষ্টির সময় ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। হেডমাস্টারমশাইয়ের পেছনের দেওয়ালটায় জমা জলের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া দাগ। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় দুটো ভালুক লড়াই করছে।

তোমার সম্পর্কে তো একটা বিচ্ছিরি গুজব উঠেছে হে দ্বারিক? তুমি শুনেছ?

এইকথা শুনে উঁচু গলায় হেসে ওঠাই উচিত, কিন্তু দ্বারিক হাসতে পারছে না, তার রাগ এসে যাচ্ছে। শরীরটা দুর্বল বলেই কি তার দ্রুত রাগ বাড়ছে আজকাল?

হ্যাঁ শুনেছি। আমি নরবলি দিয়েছি। আমাদের পাড়ারই একটি ছেলেকে চুরি করে আট দশদিন লুকিয়ে রাখার পর রাতের অন্ধকারে তার মুন্ডু কেটে রক্ত ঢেলে দিয়েছি মাটিতে। যাতে সরকারি কুয়োয় জল আসে!

লোকেরও বলিহারি! কিছু একটা কথা শুনল আর অমনি তাই নিয়ে...মানে, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে ছোটো চিলের পেছনে! হেঃ! তবে ছেলে চুরির ব্যাপারটা... কয়েকটা ছেলে সত্যিই চুরি হয়েছে শুনলাম।

স্যার, সেটাও গুজব।

সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। তুমি জান না দ্বারিক, কলকাতা শহরে একটা বড়ো গ্যাং আছে, তারা গ্রাম থেকে ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের হাত-পা কেটে কিংবা চোখ অন্ধ করে তারপর ভিখিরি বানিয়ে দেয়।

কিন্তু থানাতে একটাও ডায়েরি হয়নি। কোনো বাড়ি থেকে কেউ গিয়ে বলেনি যে তাদের বাড়ির ছেলে হারিয়েছে। শুধু লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে কথাটা।

লোকে থানায় যায় না, কারণ পুলিশের ওপর কারুর বিশ্বাস নেই! লোকের ধারণা পুলিশও গেরস্তবাড়ির ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়, কোনো হারানো ছেলেকে ফেরত আনার জন্য পুলিশের মাথাব্যথা নেই। পুলিশ সম্পর্কে তোমারও তো ভালো অভিজ্ঞতা আছে, তুমি একথা মান না?

দ্বারিক বিরক্তভাবে চুপ করে রইল।

কোনো ছেলে চুরি যায়নি বলছ? তোমাদের পাড়ারই তো ছেলেটি, কী নাম যেন, কাজল, হ্যাঁ কাজল সরকার।

ওই একজনকেই শুধু পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু একটা নরমুন্ড পাওয়া গেছে।

তার মানে, স্যার আপনিও বলির ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন?

না, না, সে আগেকার দিনে হত, রিলিজিয়াস ফ্যানাটিজম (যা বললেন) ছিল...তোমরা তো ধর্মই মান না।

নিশীথ কর্মকারের দু-হাতে তিনটি আংটি, সোনা, রুপো ও তামার, তিনরকম পাথর বসানো। টেবিলের কাচের নীচে কালীঠাকুরের ছবি।

আমি বলছিলাম কী, দ্বারিক, তুমি বরং বাড়িতে কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

কীসের জন্য বিশ্রাম?

মানে, ব্যাপারটা একটু ধামাচাপা পড়ক, লোকে কিছুদিন বাদেই ভুলে যাবে। পাবলিক মেমোরি, জান তো, প্রোভাবালি (যা বললেন) শর্ট।

স্যার, আপনি আমাকে স্কুলে আসতে বারন করছেন?

কিছুদিনের জন্য...দু-এক হপ্তা...তার মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

লোকের কথার ভয়ে আমি বাড়িতে বসে থাকলে...সেটা আমার পক্ষে...তার মানে কি লোকের কথাই মেনে নেওয়া হবে না?

দেখো। স্কুলের অ্যাটেন্সে এ দু-দিনে দারুণ কমে গেছে, ক-জন গার্জিয়ান এসে বলছেন, ছেলেরা ভয় পাচ্ছে।

তা বলে একটা বাজে গুজবকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে?

আমাকে তো সব দিক সামলে চলতে হয়...ছেলেরা যদি দলে দলে ক্লাস কামাই করতে শুরু করে?

দ্বারিক হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল মাঠে। তারপর ছুটতে লাগল।

হেডমাস্টারমশাই নেমে গিয়ে দু-তিনবার চেঁচিয়ে ডাকলেন, দ্বারিক, দ্বারিক।

কিন্তু দ্বারিক আর দাঁড়াল না।

দু-তিন ঘণ্টা মাঠের মধ্যে একটা শিমুল গাছতলায় বসে রইল সে। আর একটুক্ষণ হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনে বসে থাকলে সে বোধ হয় একটা কিছু ছুড়ে ওঁকে মেরে বসত। কিন্তু তার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

মানুষ কী বিচিত্র! কী অদ্ভুত যুক্তিবোধ! এরা বিশ্বাস করছে যে নরবলি দিলে মাটি থেকে জল ওঠে। সেই জলে চাষের উপকার হবে। ধরে নেওয়া যাক, দ্বারিক ওদের উপকারের জন্য একজন মানুষ বলি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ওরা তাকেই ভয় পাচ্ছে কিংবা ঘেন্না করছে?

ওরা কি দ্বারিককে পাগল করে দিতে চায়?

আরও একঘণ্টা সেখানেই ঘুমোলো দ্বারিক। তারপর সন্ধ্যের মুখোমুখি জেগে উঠে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। তার যদি বাড়ি না থাকত, যদি বাবা-মা কেউ না থাকত, তাহলে দ্বারিক আজই ভেগে পড়ত অন্য দিকে। কিন্তু শুধু বাবা-মা নয়, বীথিও আছে। বীথিকে কী মুখ ফুটে বলা যায়, তুমি চলে যাও!

ফেরার পথে রওনাক আলিপুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কবরখানাটা তার চোখে পড়ল। কবরখানার চারপাশে পাতলা ইটের দেওয়াল ছিল একসময়। এখন অনেক জায়গাতেই

ভেঙে গেছে। ভেতরে আগাছার ঝোপ। কাছাকাছি মনুষ্য বসতি নেই। এখানে শেয়ালের বাসা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এখানকার কবর খুঁড়ে শেয়ালেরা একটা মুণ্ডু কেন মোরামডাঙায় নিয়ে যাবে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। দ্বারিক শেয়ালের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে কিছুই জানে না।

লীলাবউদি বলেছিলেন, সেই মুন্ডুটা তাঁর ছেলের নয়। কিন্তু সে-কথায় কেউ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। যুক্তির তো কোনো প্রশ্ন নেই সেখানে। লোকে একটা গুজবের আমেজ নিয়ে মেতে থাকতে চায়।

কবরখানাটার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল দ্বারিক। কোথাও গর্ত দেখলে নীচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। নিষ্ফল তদন্ত।

একটু পরেই দ্বারিকের খেয়াল হল, কবরখানার মধ্যে তাকে যদি অন্য কেউ এখন দেখে ফেলে, তাহলে হয়তো আবার অন্য কোনো গুজবের জন্ম হবে। অন্ধকারের মধ্যে একা একা কবরখানার মধ্যে ঘুরেবেড়ানো সত্যিই তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। নরবলি সংক্রান্ত ব্যাপারে মুসলমানরা চুপচাপ আছে, এবার যদি তারাও খেপে ওঠে...।

খুব সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, প্রায় চোরের মতন ভঙ্গিতে দ্বারিক বেরিয়ে এল কবরখানা থেকে।

সেই রাত্তিরেই দ্বারিকদের বাড়িতে আগুন লাগল।

দ্বারিকের বাবা ভুবনই প্রথম চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে? কে?

ভুবনের যখন-তখন ঘুম ভেঙে যায়। তাই সে শুনতে পেয়েছিল ফিসফাস কথা। টিনের ক্যানেস্তারার মটাং মটাং শব্দ! ভুবনের চিৎকারে সবাই জেগে ওঠায় ধ্বংস হল না।

দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বাইরে থেকে। দ্বারিক দড়াম দড়াম করে লাথি মেরে দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল, এরমধ্যেই বীথি আবিষ্কার করে ফেলল যে রান্নাঘরের

দিকের দরজাটা ওরা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। বীথিই প্রথম দৌড়ে বাইরে এসে দেখতে পায় চার-পাঁচজন লোক আমবাগানের ভেতর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

আগুন লাগিয়েছিল বীথির ঘরের দিকে। টিনে করে এনেছিল কেরোসিন। তবে, কাঁচা হাতের কাজ, জানে না কী করে ইটের বাড়িতে আগুন লাগাতে হয়। অথবা ওরা হঠাৎ জেগে ওঠায় সময় পায়নি। দলে চার-পাঁচজন লোক ছিল, তবু ওরা পালিয়ে গেল কেন? দ্বারিকদের সবাইকে বেঁধে আগুনের মধ্যে ফেলে গেলেই তো পারত। ওদেরও তাহলে ভয় আছে। খুব সম্ভবত ওদের ধারণা, দ্বারিকের কাছে এক-আধটা বন্দুক-পিস্তল লুকোনো আছে ঠিকই। দ্বারিকের সামনে আসবার সাহস পায় না।

বীথি আর দ্বারিক মজা পুকুরের নোংরা কাদাভরতি জল-ই বালতি বালতি এনে ঢালতে লাগল বার বার। বীথির ঘরের জানলাটাতেই আগুন ধরে গেছে বেশি। মায়ের চেঁচামেচি শুনে সরকার বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে বিষ্ণু, সুরেনরা তিন-চারজন। তাদের চোখে-মুখে সদ্য ঘুমভাঙা চিহ্ন। পুরোনো সংস্কার অনুযায়ী এ সময় অবশ্য তারা কোনো শত্রুতা মনে রাখল না, আগুন নেভাবার জন্য সাহায্য করল যথাসাধ্য।

তবু দ্বারিক বার বার তীক্ষ্ণ চোখে ওদের দিকে চাইছিল। ওরা অভিনয় করছে না তো? ওরাই কি একটু আগে এসে আগুন লাগিয়ে গেছে? তা যদি না হয়, তাহলে যারা ছুটে পালাল, তারা কার লোক, মহাদেব সাহা, না গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই-এর? অথবা তৃতীয় কোনো শক্তি তৈরি হয়েছে? দুটো টিন ভরে কেরোসিন এনেছে, এজন্য পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কেরোসিন এদিকে সবসময় পাওয়াই যায় না, রীতিমতন দামি জিনিস!

আগুনের তেজ বেশি ছিল না। নিবিয়ে ফেলা গেল কোনোরকমে। বাইরে লোকজন যত জুটেছিল, ফিরে গেল একটু বাদে। বীথির ঘরখানা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। বাকি রাতটা তাকে বড়োঘরে মায়ের সঙ্গে শুতে হবে। কিন্তু মায়ের হা-হুতাশ আর কিছুতেই থামছে না। কী সর্বনাশ হল, কারা এই সর্বনাশ করল, এক সুরে এই কথাই বলে যাচ্ছেন বার বার।

দ্বারিক গুম মেরেছিল। একসময় তিক্তভাবে বলল, আঃ, মা চুপ করো! শুধু শুধু মড়াকান্না কেঁদে কী হবে।

এই আগুনের ব্যাপারে দ্বারিকের দু-টি উপলব্ধি হল। আজ তাদের বাড়িতে আগুন না লেগে যদি অন্য কারুর বাড়িতে আগুন লাগত, ধরা যাক, মহাদেব সাহা কিংবা গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে, তাহলে, চেঁচামেচি শুনে দ্বারিকের কি সেখানে যাওয়া উচিত হত? সে আগুন নেভাবার কাজে সাহায্য করতে গেলেও কেউ-না-কেউ বলে উঠতে পারত, দ্বারিকই আগুন লাগিয়েছে। হয়তো তখনই একটা লিনচিং শুরু হয়ে যেতে পারত।

আর শুতে যাওয়ার আগে দ্বারিক দু-একবার ভেবেছিল, বীথিকে বলবে, কয়েকদিনের জন্য বহরমপুর ঘুরে আসতে। কিন্তু আগুন লাগবার ফল হল এই, দ্বারিক সে-কথা আর কিছুতেই বলবে না। বীথি যাবে না, এখানেই থাকবে।

দ্বারিক কিছুতেই হার মানবে না।

৯. নুটু বলল, তুমি যা বলছ দ্বারিকদা

নুটু বলল, তুমি যা বলছ দ্বারিকদা, তা ঠিকই, আমি মানি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি তো এখানে থাকতে পারছি না!

দ্বারিক যেন একটা শারীরিক আঘাত পেল।

তুই এখানে থাকবি না? কোথায় যাবি?

এখানে থাকলে খাব কী? বাবা জমি-টমি সব বিক্রি করে দিয়ে ফতুর হয়ে বসে আছে...আমাকে যেতে হবে জামশেদপুরে, সেখানে এক মামা আছেন।

সেখানে চাকরি করবি!

পেলে তবে তো! চেষ্টা করে দেখতে হবে কতদিনে জোটে। মামার কাছে থাকলে কিছুদিন খাওয়া-পরাটা অন্তত জুটবে...জেলে থাকার সময় পড়াশুনোটাও শেষ করতে পারলাম না, আলসারে এত কষ্ট পেতাম।

এখন সেটা কমেছে?

অনেকটা...আমি স্বীকার করি, আমাদের আবার দল গড়া উচিত, নইলে আমরা হারিয়ে যাব, আমাদের এতদিনের কাজ, এত পরিশ্রম সব নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে আমার তো গ্রামে থাকার আর কোনো উপায়ই নেই...এক-এক সময় মনে হয়, জেলেই ভালো ছিলাম, তখন অন্তত সংসারের চিন্তা করতে হয়নি।

রবি তো আর তোদের সঙ্গে মেশে না আজকাল।

মিশবে না কেন, দেখাসাক্ষাৎ হয়, কিন্তু ও অন্য পার্টিতে ভেড়বার তালে আছে..সুখময়কে ওর বাড়ির লোকেরা এখন একদম বেরোতেই দেয় না বাড়ি থেকে, পরশু আমি ডাকতে

গেলাম, ওর মা বললেন, সুখু বাড়ি নেই, অথচ আমি ঠিক বুঝেছিলাম, বাড়িতেই আছে...আমি হাসলাম।

তা বলে সুখময় কিছুতেই চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকার ছেলে নয়।

শুনছি ও-ও আর গাঁয়ে থাকবে না...আসানসোল চলে যাবে।

বীথি চা নিয়ে এল ওদের জন্য। নুটু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে হালকা গলায় বলল, কি বউদি, কাল রাত্তিরে আর একটু হলেই আগুনে রোস্ট হয়ে যাচ্ছিলেন?

ভুতো আর নুটু প্রায় সমান বয়সি। তবু ভুতোর বউকে সে বউদি বলে সম্বোধন করছে। লজ্জা পাচ্ছে শুধু নাম ধরে ডাকতে।

বীথি বলল, আপনি এত সকাল সকাল খবর পেয়ে গেলেন কী করে?

গাঁয়ের একটা নিজস্ব টেলিগ্রাফ সিস্টেম আছে। আর কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন। শহরের লোক পাশের বাড়ির খবরও রাখে না, কিন্তু গাঁয়ে একটা কিছু ঘটলেই আশপাশের পাঁচখানা গ্রামে সঙ্গে সঙ্গে রটে যায়।

দ্বারিক বলল, যারা আগুন লাগাতে এসেছিল, তারাই বোধ হয় রটিয়েছে।

নুটু বলল, সেটাও আশ্চর্য কিছু না। হয়তো তারা তোমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়নি, তোমাদের ভয় পাইয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল!

বীথি বলল, এবার আমরা একটা কথা রটিয়ে দিলে পারি না? যে, আমরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছি, আর ভয় পাওয়ারও দরকার নেই!

দ্বারিক জিজ্ঞেস করল, তুমি সত্যি ভয় পেয়েছ নাকি, বীথি?

আমি...আমি মায়ের কথা ভেবে বলছি।

নুটু বলল, আমাদের মায়েদের জন্য আগে একটা ট্রেনিং কোর্স খোলা উচিত ছিল। সব বাড়িতেই মায়েদের নিয়ে একটা বড়ো সমস্যা!

দ্বারিক লক্ষ করল, আগুন লাগার খবর শুনেই নুটু ছুটে এসেছে বটে, কিন্তু ঘটনাকে যেন সে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না। দ্বারিকরা যে সত্যিই একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে, সেটা কি বুঝতে পারছে না নুটু? অথবা, সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলেই আর এসব সমস্যার মধ্যে মাথা গলাতে চায় না!

তুই কবে চলে যাচ্ছিস নুটু?

পরশু!

রাজেন, অনন্ত ওরা কোনো খবর পায়নি।

জানি না! রাজেনের সঙ্গে দেখা হয় না, ও আবার পড়াশুনো শুরু করবে শুনেছি। অনন্তটা ফেরার পর থেকেই রক্ত আমাশয়ে ভুগছে।

আমি আর বীথি রোজ পালা করে রাত জেগে পাহারা দেব। আবার যদি কেউ আগুন দিতে আসে...

কারা আগুন দিতে এসেছিল, তুমি জান না, দ্বারিকদা?

কী করে জানব?

নিশ্চয়ই মহাদেব সাহার লোক।

তার এতখানি সাহস হবে?

তুমি এখন এই গাঁয়ে একা পড়ে গেছ, তাই ওরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।

সেইজন্যই তো আমি দল গড়তে চেয়েছিলাম। তোরা সবাই পালিয়ে যাচ্ছিস...কিন্তু আমি পালাব না।

দ্বারিকা, পাঁচ-ছ-বছর আগে আমরা সবাই ছিলাম ছাত্র। এখন আর ছাত্র নই। এখন একটা কঠিন জিনিসের মুখখামুখি এসে পড়েছি...দু-বেলা দুটো ভাত অন্তত জোগাড় করতে হবে তো! এখন চাকরি-বাকরি খোঁজা ছাড়া উপায় কী? এই সময় ভুলতা ফিরে এলে তোমাদের অনেক সাহায্য হত।

দ্বারিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নুটু বীথির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারাশরীরে চোখ বুলোলো দু-বার। তারপর খালি কাপটা বীথির হাতে তুলে দিল। বলল, আর এক কাপ চা চাইলে কি খুব অন্যায় আবদার করা হবে বউদি?

বীথি বলল, আপনি গুড়ের চা খেতে পারবেন? সামান্য একটু চিনি আছে, সেটুকু বাবার জন্য লাগবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুড়ের চা- ও খুব চমৎকার।

দ্বারিক বুঝেছিল, নুটু চাইছে বীথিকে কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিতে।

দ্বারিকদা, তুমি বউদিকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে না কেন?

কেন, হঠাৎ তাকে জোর করে পাঠাতে যাব কেন?

বউদি এখানে থাকলে তুমি আরও বিপদে পড়বে, সেটা বুঝতে পারছ না?

কীসের বিপদ?

কিছু লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে তোমার নামে এখন নানা কথা রটাচ্ছে। এখন চোর-গুণ্ডা বদমাশদের নজর পড়বে তোমাদের বাড়ির দিকে। ওরা বোঝে যে এই সময় তুমি পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাবে না। এই সময় বউদির মতন একটি যুবতী মেয়ে বাড়িতে থাকলে—তুমি একলা—

তা বলে আমি ভয় পেয়ে ওকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেব? আসল ব্যাপারটা আমি জানি। তোমার এখন সঙ্গে থাকলেও তুমি নিজে মুখ ফুটে সে-কথা বউদিকে বলতে পারবে না! তোমার সম্মানে লাগবে! তাহলে আমি বউদিকে বুঝিয়ে বলব?

না!

দ্বারিক এত জোরে বলল কথাটা যে নুটু চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ। নুটু তাকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ভাবটা সহ্য হচ্ছে না দ্বারিকের।

নুটু একটা কাঠি দিয়ে দাগ কাটছে মাটিতে। দ্বারিক যখন পছন্দ করছে না, সে আর কিছু বলতে চায় না।

তুই শুনেছিস, আমার নামে নরবলি দেওয়ার গুজব উঠেছে?

না শুনে উপায় কী? চারদিকে ম-ম করছে গুজবটা। তোমার নাকি চোখ দুটো এখন টকটকে লাল! সত্যিই খানিকটা লালচে হয়েছে তোমার চোখ, দ্বারিকদা!

তুই হাসছিস, নুটু?

হাসব না? এ-রকম একটা অদ্ভুত কথা নিয়েও লোকে মাতামাতি করতে পারে!

তোর নামে এ-রকম গুজব উঠলে তুই কী করতিস?

কিছুদিন অন্য কোথাও চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতাম!

আমি এখন এখান থেকে পালিয়ে গেলে আর আমার ফিরে আসবার পথ থাকবে? পালিয়ে যাওয়া মানেই তো মেনে নেওয়া!

তুই চাইছিস, বীথিকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিই? আমি নিজেও পালিয়ে যাই? বাঃ বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা! এই তোর রাজনৈতিক শিক্ষা।

আমি তোমায় পালাতে বলছি না দ্বারিকা। এখানে থাকলে তুমি কি করতে পারবে না। সিউড়িতে, মেদিনীপুর, কলকাতায় আবার নতুন করে দল গড়া হচ্ছে, তুমি সেখানে গিয়ে যোগ দিতে পার, আবার কাজ শুরু করতে পার।

মোটেই না। আমি এখানেই দল গড়ব! তোদের যদি না পাই, আমি যাব মালোপাড়ায়, ওরা ভীতু নয়, আমি ওদের নিয়েই দল গড়তে পারি, আবার!

নুটু আস্তে আস্তে বলল, আমি যদি গ্রামে থাকতাম, আমিও মালোপাড়ায় গিয়েই নতুন করে কাজ শুরু করতাম। তুমি কি এর মধ্যে গিয়েছিলে ওদিকে? আমি গিয়েছিলাম... দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মালোপাড়াটা মোরামডাঙা গ্রামের একটু বাইরের দিকে। এখান থেকে মল্লিকপুর যেতে মাঝামাঝি পথে পড়ে। মালোরাই এদিককার খেত-মজুরি করে। সাঁওতালরা এদিকে আসে না। প্রথম রাজনীতি করতে নেমে দ্বারিকরা মালোপাড়াতেই কাজ শুরু করেছিল।

নুটু বলল, মালোপাড়া সম্পর্কে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিতে পারি। কুয়োতে জল আসায় ওরা খুব খুশি হয়েছে। একটা নালি কাটা হচ্ছে মালোপাড়ার পাশ দিয়ে, সেখানে জলের মধ্যে দাপাদাপি করছে ছেলে-বুড়ো সবাই! জল মানেই সৌভাগ্য! ওরা তোমার নাম করছিল! ওরা বিশ্বাস করে, তুমি নরবলি দিয়ে ওদের দারুণ উপকার করেছ!

নুটুর কথায় দ্বারিক একটু একটু খুশি হয়ে উঠছিল, আবার দমে গেল খুব!

ফ্যাকাশে গলায় বলল, ওরা বিশ্বাস করে?

হ্যাঁ করে। কিন্তু ভদ্রলোকদের মতন ওরা ভন্ড নয়! তুমি ওদের উপকার করেছ, তাতেই ওরা কৃতজ্ঞ। গাঁয়ের ভদ্রলোকশ্রেণি, যারা ওই গুজবটা ছড়াচ্ছে, তারা ওই জল ব্যবহার করবে কিন্তু তোমাকে একঘরে করে রাখবে কিংবা গাঁ থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে। কিন্তু মালোরা এখন তোমায় পেলে নাচবে মাথায় করে।

কিন্তু একটা মিথ্যে কথা...একটা জঘন্য মিথ্যে কথা...ওই জলের জন্য আমি কিছুই করিনি।

তবু মালোদের মধ্যে কাজ করতে গেলে...তুমি এটার সুযোগ নাও।

একটা কুসংস্কার—ওদের মধ্যে আমি সেটাকে আরও দূর করব?

বীথি আবার চা নিয়ে আসতেই নুটু তিন-চার চুমুকে তাড়াহুড়ো করে শেষ করে ফেলল সেই চা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম বউদি।

যেন নুটু বেশিক্ষণ বীথির সামনে থাকতে চায় না। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কেন সে এত আড়ষ্ট ব্যবহার করছে কে জানে।

বীথি জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে আজ খেয়ে যাবেন?

নুটু বলল, না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। বাড়িতে একজন লোক আসবে। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে সে বলল, চলি বউদি, আমি পরশু দিনই জামশেদপুরে চলে যাচ্ছি, হয়তো এর মধ্যে আর দেখা হবে না...। তবে, ভুতো ফিরে এলে, দ্বারিকদা একটা খবর দিয়ে। আমি নিশ্চয়ই এসে দেখা করে যাব।

দ্বারিক বলল, চল, নুটু তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বীথি জিজ্ঞেস করল, আপনি আজ স্কুলে যাবেন না?

স্কুলে এখনও চাকরিটা আছে কিনা দ্বারিক তা-ই জানে না। অন্তত আজ তো স্কুলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সে দু-দিকে মাথা নেড়ে বলল, না আজ একবার থানায় যেতে হবে।

নুটুর পাশাপাশি কিছুক্ষণ দ্বারিক হেঁটে গেল নিঃশব্দে। এবার নুটু সাইকেলে উঠবে!

দ্বারিক তার একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, তোকে একটা কথা বলছি নুটু...তোর কাছে...লুকোনো কোনো আর্মস আছে?

আর্মস?

একটা রিভলবার...কাছে রাখতে চাই!।

ও কাজও কোরো না দ্বারিকদা!

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার চারদিক দিয়ে একটা বিপদ ঘিরে আসছে, একটা নির্বোধ শক্তি যেন আমায় পিষে ফেলবে...সেইজন্য আমারও একটা কিছু অবলম্বন দরকার...অন্তত লোককে ভয় দেখাবার জন্যও।

এক সঙ্গে বহু লোক এলে তুমি একটা রিভলবার দিয়ে কী করবে? তাতে আরও বিপদ বাড়বে! তুমি নিরঞ্জনদার খবর শোনোনি?

কী হয়েছে নিরঞ্জনদার?

ধানকা গ্রামে ডাকাতি হয়েছিল...পুলিশ এসে নিরঞ্জনদার বাড়ি সার্চ করে দুটো আর্মস পায়...নিরঞ্জনদাকে ডাকাতির চার্জ দিয়ে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

নিরঞ্জনদা কক্ষনো ডাকাতি করতে পারে না।

সে তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু পুলিশ যদি এ-রকম ফলস চার্জ দিয়ে ধরে নিয়ে যায়...এখন তোমার ওপর নজর পড়তে পারে...

ঠিক আছে, তুই যা।

আমি চলে যাচ্ছি বলে তুমি আমাকে স্বার্থপর ভাবছ হয়তো, কিন্তু আমার উপায় নেই। আমার বাড়িতে একদিন গেলে তুমি বুঝতে পারবে..বড়োমামা একটা ইন্টারভিউয়ের কথা লিখেছেন, নইলে আমি হয়তো কিছুদিন থেকে যেতাম।

তার দরকার নেই, তুই যা, আমার জন্য চিন্তা করিস না কিছু...

আমার কাছে কোনো আর্মস নেই লুকোনো, তোমায় সত্যি বলছি, থাকলে হয়তো তোমায় দিতাম..কিন্তু অনেক লোকের বিরুদ্ধে একটা রিভলবার নিয়ে দাঁড়ানো আরও ডেঞ্জারাস, আমার অভিজ্ঞতা আছে, সেইজন্যই তোমাকে বললাম।

বুঝেছি, আমিও তা জানি, হঠাৎ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

দ্বারিকদা, তোমাকে একটা কথা বলব? তুমি আমার সাইকেলটা নেবে?

দ্বারিক চমকে উঠে বলল, কেন তোর সাইকেল আমি নেব কেন?

এটা রাখো তোমার কাছে...আমি তো চলেই যাচ্ছি, আমার কাজে লাগবে না, তোমার কাজে লাগতে পারে...হঠাৎ কোনো দরকার হলে তুমি যদি সুখময়কে রাজেনকে খবর দাও, আমার বিশ্বাস ওরা ঠিকই ছুটে আসবে।

আমি কারুকে ডাকতে যাব না।

তবু সাইকেলটা রাখখা...তুমি থানায় যাবে বলছিলে, অত দূরের রাস্তা...

কিন্তু সাইকেল...একটা দামি জিনিস...তোর জিনিসটা আমি রাখব কেন?

এটা আমার না, বাবার। বাবা এখন বাতের ব্যথার জন্য চালাতে পারেন না। আমি চলে গেলেই বাবা এটা বিক্রি করে দিতেন। তোমার কাছ থেকেও বাবা এটা চেয়ে পাঠাবেন নিশ্চয়ই...

তবু যে ক-দিন হয় রাখো তোমার কাছে, আমি বাবাকে বলে যাব।

সাইকেলটা দ্বারিকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নুটু বলল, দ্বারিকদা, তুমি এটা রাখো, না হলে বুঝব তুমি আমার ওপর রাগ করে আছ।

দ্বারিক বিব্রতভাবে বলল, ঠিক আছে...কিন্তু এখন...তুই এখনই রেখে যাচ্ছিস কেন...আমি পরে তোর বাড়ি থেকে চেয়ে নেব।

না তুমি রাখো।

তুই এখন যাবি কী করে?

আমার কোনো অসুবিধে হবে না...কদমতলি থেকে বাসে চেপে যাব—তুমি রাখো।

নুটু আর দাঁড়াল না। হাঁটতে লাগল খুব জোরে জোরে। সোজা টানা রাস্তা। নুটুকে অনেকক্ষণ দেখা যায়। দু-তিনবার পেছন ফিরে তাকাল নুটু।

দ্বারিক মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১০. আলুসেদ্ধ দিয়ে গরম ফেনাভাত

আলুসেদ্ধ দিয়ে গরম ফেনাভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্বারিক! বাড়িতে আগুন লাগাবার

ব্যাপারটা থানায় একবার খবর দিতেই হবে। খবর দিলেই যে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার করবে কিংবা অপরাধীদের ধরে ফেলবে, দ্বারিক তা আশা করে না। কিন্তু পুলিশের মনোভাবটা কী, সেটা একবার জেনে আসা দরকার অন্তত।

বেরোবার আগে বীথিকে বলে গেল, সে কোথায় যাচ্ছে, সেটা মাকে না জানাতে। থানা পুলিশের নাম শুনলেই মা উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠেন।

বীথিও বলল, এই রোদুরের মধ্যে অতদূর যাচ্ছেন কষ্ট করে?

দ্বারিক বলল, সাইকেলটা রয়েছে, যেতে কোনো অসুবিধে নেই।

নরবলির ব্যাপারে দ্বারিকের নামজড়ানো গুজবটা বীথি শুনেছে কিনা কিছু বোঝা যায় না। বীথি কক্ষনো উল্লেখ করেনি। তবে বাবা-মা বোধ হয় এখনও শোনেননি, তা হলে মা এতদিনে বাড়ি মাথায় করতেন। বীথিই সম্ভবত মাকে আগলে রাখছে।

সাইকেলটা পেয়ে দ্বারিকের মনে একটা ফুর্তির ভাব এসেছে। ছেলেবেলায় তাদের বাড়িতেও একটা সাইকেল ছিল। সেই সাইকেল চড়া নিয়ে ভুতোর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হত তার। একটু ফাঁক পেলেই ভুতো পালিয়ে যেত সাইকেলটা নিয়ে।

পেঁয়াজের চাষটা ভালো হলে দ্বারিকও একটা সাইকেল কিনে ফেলবে।

তেঁতুলিয়া মোড়ের কাছে বেশ ভিড়। কীসের যেন একটা পুজো চলেছে। এ গ্রামে এটাই বারোয়ারি পুজোর জায়গা। বছরের এ সময়টায় কোন পুজো হয়, দ্বারিক ঠিক খেয়াল করতে পারল না।

ভিড় ভেদ করে যেতে হবে, দ্বারিক ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তাতেও সহজে ভিড় সরছে না দেখে সে নেমে পড়ল সাইকেল থেকে।

সেই নুয়ে পড়া অশ্বত্থগাছটার গুঁড়ির ওপর আজ আবার অনেকগুলো ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। গাছটা হেলে পড়েছে অনেকখানি, কয়েকটা টাটকা শিকড় ছিড়ে গেছে দ্বারিক দেখেই বুঝতে পারল। বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে যে তেজস্বী গাছটা, তাকে এরা কিছুতেই বাঁচতে দেবে না।

দ্বারিক আজ আর ছেলেগুলোকে ধমক দিতে পারল না। তার সেই জোর নেই। সে কিছু বলতে গেলে অনেকে তার মুখের ওপর খেকিয়ে উঠতে পারে। সে অনুভব করতে পারছে, অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি তার ওপর স্থির নিবদ্ধ।

একটা কথাও কেউ বলল না তার সঙ্গে।

এটাই সবচেয়ে অস্বাভাবিক চিহ্ন। গ্রামের পথ দিয়ে কেউ গেলে অন্য যার সঙ্গেই দেখা হবে, সেই কিছু-না-কিছু কথা বলবে। যত অপ্রয়োজনীয় কথাই হোক। কোথায় চললে—এ প্রশ্ন তো করবেই। কেউ সে প্রশ্ন করল না দ্বারিককে।

ভিড় একটুখানি ফাঁক হয়ে গেছে, তার মধ্যে দিয়ে সাইকেলসুদ্ধ হেঁটে যাচ্ছে দ্বারিক। আপনিই তার মাথা নীচু হয়ে গেছে, সে কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। তার বুকের মধ্যে তীব্র অভিমান।

দু-তিন জন স্ত্রীলোক কান্নাকাটি করছে একসঙ্গে। আরও অনেক স্ত্রীলোক তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার নাম করে চেঁচামেচি করছে খুব। বহুকালের সংস্কার থেকে দ্বারিক জানে, কোনো বাড়িতে হঠাৎ কিছু বিপদ ঘটলেই এ-রকম হয়। বিপদ কাটাবার জন্য দৌড়ে আসে এখানে পুজো দিতে।

বড়োধরনের একটা কিছুই হয়েছে মনে হচ্ছে। কোন বাড়িতে?

দ্বারিক কারুকে জিজ্ঞেস করতে পারল না। অথচ তার দারুণ কৌতূহল হল। বিপদের কথা না-শুনে চলে যাওয়া যায়?

দ্বারিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। যদিও তার বুকে-পিঠে বিধছে অনেক বিদ্বেষ আর ঘৃণার দৃষ্টি, তবু সে পালিয়ে যাবে কেন? এই গ্রামে সে জন্মেছে, এখানকার প্রতি ইঞ্চি মাটি সে চেনে, এখানে যেকোনো জায়গায় দাঁড়াবার অধিকার তার আছে।

পুজো হচ্ছে মনসার। মেয়েদের চিৎকার ও কান্নার মধ্য থেকে আসল খবরটা বার করার জন্য দ্বারিক কান পেতে রইল। একটি যুবতী মেয়ে কাঁদছে মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে। দ্বারিক চিনতে পারল তাকে। গোষ্ঠ ভট্টাচার্যর পুত্রবধূ।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের একমাত্র আদরের নাতিকে সাপে কামড়েছে আজ সকাল বেলা।

দ্বারিক শিউরে উঠল। এইসব গ্রামে-গঞ্জে সাপে কামড়ালে প্রায় কেউই বাঁচে না। সবসময় সাপের বিষে মরে না, অন্য মানুষরাই মেরে ফেলে। তা ছাড়া রয়েছে ভয়।

ছেলেবেলা থেকেই দ্বারিক সাপ দেখতে অভ্যস্ত। অ্যাবসকণ্ড করে থাকার সময় তাকে মাঝে মাঝে বনেজঙ্গলেও রাত কাটাতে হয়েছে। একবার প্রায় তারই সামনে অবনীদাকে সাপে কামড়াল। অসম্ভব মনের জোর অবনীদার। ছুটে গিয়ে তিনি নিজে সাপটাকে মারলেন। দ্বারিকদের ডেকে বললেন, এটা ঢ্যামনা সাপ। এ সাপের বিষ থাকে না। ছুরি দিয়ে পায়ের সেই জায়গাটা খানিকটা চিরে দিয়ে বললেন, দেখিস যেন আমি ঘুমিয়ে না পড়ি। আমার চোখবুজে এলেই আমায় ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিবি!

দ্বারিক বলেছিল, অবনীদা, তবু একবার ডাক্তার দেখানো দরকার, আমরা আরও চারজন আছি, তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। ঘণ্টা দুয়েকের তো রাস্তা।

অবনীদা বলেছিলেন, আমি মরে গেলে তোরা বয়ে নিয়ে যাবি নিশ্চয়ই, কিন্তু এক্ষুনি কি মেরে ফেলতে চাস নাকি? বললাম তো, এ সাপের বিষ নেই! শতকরা সাতানব্বইভাগ

সাপই বিষাক্ত নয়, যেগুলোর বিষ আছে সেগুলোও সবসময় পুরোপুরি বিষ ঢালতে পারে না। মানুষ মরে ভয়ে।

পরদিনই অবনীদা দিব্যি সুস্থ লোকের মতো হাঁটাচলা করেছিলেন।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের নাতিকেও নিশ্চয়ই এরা ভয় দেখিয়েই মেরে ফেলবে।

দ্বারিকের মনে পড়ল, গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে কোনো ডাক্তার কবিরাজ ঢোকে না। তিনি নিজে চিকিৎসা করেন। বাচ্চাটাকে বোধ হয় তিনি ছাইগোলা খাওয়াচ্ছেন। অথচ, বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও সময়মতন ইঞ্জেকশন দিয়ে সারিয়ে তোলা যায়।

পাঁচ বছরের ফুটফুটে বাচ্চাছেলেটা। সুন্দর টানা টানা চোখ, গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের ভীষণ আদরের। তবু নিজের দোষেই তিনি মারলেন ছেলেটাকে। ছেলেটার মা মনসার পুজো দিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছে, মৃত্যুকালে বোধ হয় দেখতেও পাবে না ছেলেটাকে।

দ্বারিক খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। তার মনে পড়ল গতরাত্রির কথা। তার নিজের বাড়িতে আগুন লাগবার বদলে যদি অন্য কারো বাড়িতে আগুন লাগত, ধরা যাক গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতেই, সেখানে দ্বারিক ছুটে গেলে কেউ নিশ্চয়ই অপবাদ দিত যে দ্বারিকই আগুন লাগিয়েছে। দ্বারিককে শাস্তি দেওয়ার এটাই সহজতম পথ।

তা বলে কি কারোর বাড়িতে আগুন লাগার খবর শুনেও দ্বারিক যাবে না? দ্বারিকের চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল। সে যদি না যায়, তাহলে তার সারাজীবনের সব শিক্ষাই মিথ্যে।

দ্বারিক সাইকেলের মুখটা ফেরালো। নুটু ভাগ্যিস আজ সাইকেলটা রেখে গেছে। এ দিয়ে অনেক কাজ হবে। দ্বারিক খুব তাড়াতাড়ি মল্লিকপুরে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে পারে! সবচেয়ে ভালো হয়, ছেলেটাকেই সাইকেলের ওপর বসিয়ে চট করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া।

ওকে ঘুমোতে দেবেন না! জাগিয়ে রাখুন।

কালীমূর্তির সামনে পদ্মাসনে বসে আছেন গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই। পাশেই শুয়ে আছে ছেলেটা চোখ বুজে। জ্যাঠামশাই ওর মাথায় জল ঢেলে যাচ্ছেন। জ্যাঠামশাইয়ের ছোটোছেলে থাকে আসানসোলে, তাকে খবর পাঠানো হলেও সে কালকের আগে এসে পৌঁছোতে পারবে না।

কাঠের গেটটা বন্ধ। দ্বারিক সেটা ঠেলে খুলতে যেতেই গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমার এখানে কী চাই?

অন্যরকম কণ্ঠস্বর। যেন তিনি দ্বারিককে চেনেনই না। ধোঁয়ায় বসে থাকার জন্য তাঁর চোখ দুটো লালচে।

জ্যাঠামশাই সাপের বিষের ভালো ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল..একটা-দুটো ইঞ্জেকশন দিলেই।

তোমায় এখানে কে আসতে বলেছে? ভেতরে ঢুকো না।

জ্যাঠামশাই, এখন রাগারাগির সময় নয়...আমি ডাক্তার ডেকে আনতে পারি।

খোকা ভালো আছে। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, সেটা খুব খারাপ, ওকে জাগিয়ে রাখুন।

ভেতরে ঢুকবি না! বেরিয়ে যা হতভাগা! বাড়িতে শুদুরের মেয়ে এনে বংশের সর্বনাশ করেছিস।

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ওগো, তুমি চুপ করো। মাথাগরম কোরো না! বাবা দ্বারিক, তুমি বরং এখন যাও।

জ্যাঠাইমা, ছেলেটার চিকিৎসা হওয়া দরকার—এখনও সময় আছে।

উনি ওষুধ দিয়েছেন, তাতেই ভালো হয়ে যাবে!

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য হুংকার দিয়ে বললেন, ও আমার ওষুধ ফেলে দিয়েছিল, এতবড়ো সাহস! ওকে দূর হয়ে যেতে বলো! আমি এ পাতকীর মুখও দেখতে চাই না!

দ্বারিক বলল, জ্যাঠামশাই, আমি অন্যায় করেছিলাম সেদিন, আমি আরও অন্যায় করেছি, কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে একবার ডাক্তার দেখালে ভালো হত—আমি ডেকে নিয়ে আসব?

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য আবার ঠাকুরের দিকে মুখ করে চোখ বুজে বসলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই!

জ্যাঠাইমা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দ্বারিকের দিকে। তাঁর মুখখানাতে যেন মাকড়সার জাল আঁকা। তিনিও আর কথা বললেন না একটাও।

ক্ষুণ্ণভাবে দ্বারিক ফিরে চলল, গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই নিজের জেদ বজায় রাখবেনই। সেদিন দ্বারিক ওঁর ওষুধ নিতে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই ওঁর এত রাগ। সেই ছাইয়ের ডেলাটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পরে অন্য কোথাও ফেলে দিলেই হত। ওটাই দ্বারিকের ভুল হয়েছে।

এখন সে নিজে ঝুঁকি নিয়ে মল্লিকপুর থেকে ধ্যানেশ ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারে। কিন্তু জ্যাঠামশাই যদি তাঁকেও বাড়িতে ঢুকতে না দেন! কারোকে সাপে কামড়ালে যদি তার বাড়ির লোক ডাক্তারকে খবর না দেয়, তবে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো আইন নেই? সেরকম কিছু থাকলেও সেই আইনকে লড়তে হবে কালীঠাকুর কিংবা মা-মনসার বিরুদ্ধে।

খানিকটা পথ আসবার পর দ্বারিক দেখল এক দঙ্গল মহিলা ফিরে আসছেন তেঁতুলিয়ার মোড় থেকে। মাঝখানে রয়েছেন গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই-এর ছোটোছেলের স্ত্রী। তাঁর চুল খোলা, শাড়ির আঁচলটা লুটোচ্ছে, চোখের দৃষ্টি জলে-ডোবা মানুষের মতন! দু-হাতে ধরা একটা মাটির সরায় প্রসাদ আর ফলমূল। এঁরা মা-মনসার কৃপা নিয়ে যাচ্ছেন।

এই মহিলাকে যদি বোঝানো যায় যে আপনার ছেলের চিকিৎসার দরকার। এখনও সময় আছে।

দ্বারিক ডাকল, ছোটোবউদি।

আসলে সে ডাকল মনে মনে, তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। সে দাঁড়িয়ে রাস্তার একপাশে, মহিলারা তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। চলে গেল তাকে পেরিয়ে, প্রায় ছুটতে ছুটতে।

শীতের পর প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সাপগুলো বেরিয়ে পড়ে। বহুদিন উপপাসের ফলে তারা খুব বদরাগি হয়ে থাকে এই সময়টায়। দ্বারিকের মনে পড়ল, তার যখন আট-ন বছর বয়েস, সেই সময় তারই এক খেলার সঙ্গী, লস্কর বাড়ির ছেলে শিবুকে সাপে কামড়েছিল। তখন ঠিক এইভাবেই মনসা পুজো দেওয়া হয়েছিল, প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে ঠিক এইভাবে ছুটে গিয়েছিলেন শিবুর মা আর মাসি-পিসিমা। শিবু বাঁচেনি। তারপর একুশ-বাইশ বছর কেটে গেছে একটুও বদলায়নি এই গ্রাম।

কাজ শুরু করতে হবে, অনেক কাজ বাকি, কিন্তু ঠিক কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে, সেটাই হচ্ছে কথা।

থানার এ এস আই সমর দাস যেন দ্বারিকের প্রতীক্ষাতেই ছিল। দেখামাত্র ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি এসেছেন! যাক, ভালোই হল, আমি নিজেই যাচ্ছিলাম আপনার বাড়িতে!

দ্বারিক একটু অবাক হয়ে বলল, আপনারা খবর পেয়েছেন তাহলে?

কীসের খবর?

আমার বাড়িতে কাল আগুন লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল।

সমর দাস তার অভ্যেসমতো ভুরু তুলে বলল, আগুন লাগানো! না, সে খবর তো শুনিনি? কেউ মারা গেছে?

না, তা যায়নি অবশ্য। কিন্তু যেতে পারত। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এ-রকম কেস তো এদিকে আগে হয়নি। আপনি ঠিক জানেন, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? অনেক সময় এমনি এমনি আগুন লাগে।

আমি এত দূরে এসেছি কি মিথ্যে খবর দিতে?

না, না, সেকথা বলছি না, অনেক সময় ভুল বা...দরজা বন্ধ ছিল অথচ কেউ মারা গেল না।

আমরা বাড়িসুদ্ধ ভেতরে পুড়ে মরলে কেসটা অনেক জোরালো হত বটে।

আ হা-হা, সে-কথা বলছেন কেন, ব্যাপারটা সিরিয়াস...আগুন লাগাবার চেষ্টা গোটাবাড়িটাই পুড়ে গেছে?

না, তাও যায়নি..ক্ষতি খুব বড়ো রকমের হয়নি—আওয়াজ শুনে আমার বাবা জেগে উঠেছিলেন...ওরা পালিয়ে যায়।

তা হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি।

না, কিন্তু কিছু লোক আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল...আবার চেষ্টা করতে পারে।

কারোকে সন্দেহ করেন?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বারিক বলল, না।

আপনি ডায়েরি করবেন?

থানায় ঢোকার পর থেকেই দ্বারিকের মেজাজ বিগড়ে গেছে। এসেই মনে হল, না এলেই ভালো হত। এই পুলিশের কাছ থেকে সে কী সাহায্য পাবে? এরা তার বাড়ি রক্ষা করবে? এখনও হরিজনদের গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

থানাটাকেই তার একটা নোংরা জায়গা বলে মনে হয়।

অস্থিরতা কমাবার জন্য সে সিগারেট ধরাতে গেল। পকেটে সিগারেট আছে, কিন্তু দেশলাই আনতে ভুলে গেছে। সমর দাস নিজেই তার দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, এই যে নিন।

প্রথম টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাশির দমক এসে গেল। কথা বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারল না কিছুক্ষণ। এবার তাকে কাশির চিকিৎসা করাতেই হবে ভালো করে।

একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আপনারা আগুন লাগাবার খবর পাননি—তবু আমার বাড়িতে যাচ্ছিলেন কেন?

সমর দাস একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি আমাদের বড়োবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করুন।

কেন, কী ব্যাপার?

বড়োবাবু শশিভূষণ দে এদিককারই লোক। বেশ বড়োবাবুসুলভ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। অনেকদিন ছিলেন মুর্শিদাবাদের দিকে, সম্ভবত ধরাধরি করে এবার নিজের বাড়ির কাছে পোস্টিং নিয়েছেন। দু-বছর বাদেই রিটায়ার করবেন।

ভুবন মাস্টারের ছেলে না আপনি? মিসায় ছিলেন?

দ্বারিক বলল, না, মিসা নয়। পলিটিক্যাল আণ্ডারট্রায়াল প্রিজনার ছিলাম।

বেলে আছেন, না খালাস পেয়েছেন?

সব কটা ফলস কেস উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে। আমরা আনকণ্ডিশনাল রিলিজ পেয়েছি।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।

দেওয়ালের একটা পুরোনো ক্যালেণ্ডারে ইন্দিরা গান্ধীর ছবি। দারোগাবাবু বোধ হয় ক্যালেণ্ডারটা সরিয়ে ফেলতে ভুলে গেছেন। দ্বারিক বেপরোয়া ভঙ্গিতে সামনের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

আপনার নামে তো আবার কমপ্লেন এসেছে...ডি এস পি সাহেব নোট পাঠিয়েছেন।

দ্বারিক ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, এবার আমি কী করেছি? ডাকাতি না রেপ? অথবা ছোটোমেয়ের গলা থেকে হার ছিনতাই?

বড়োবাবু ধমকের সুরে বলল, প্রায় দু-শো লোক সই করে পিটিশন পাঠিয়েছে—তাও আমার কাছে নয়, খোদ এস. পি. সাহেবের কাছে, তাতে আপনার নামে অভিযোগ আছে।

দ্বারিক কিছু বলবার আগেই সমর দাস বলল, স্যার, সেই যে নরবলির ব্যাপারটা, সেটা নিয়ে আরও ঘোঁট পাকিয়েছে...লোকে বলছে আমরা কোনো অ্যাকশন নিচ্ছি না—এদিকে কলকাতার কাগজে পর্যন্ত খবর ছেপেছে...পরশুদিন এখানে কী হয়েছে জানেন স্যার, এক ব্যাটা গরিব হিন্দুস্থানি, পুরোনো কাগজ-টাগজ বিক্রি করে, তাকেই ছেলেধরা সন্দেহ করে লোকে বেধড়ক পিটিয়েছে—ব্যাটা মরেই যেত আর একটু হলে।

দ্বারিক তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, নরবলির ব্যাপারে কিছু প্রমাণ পেয়েছেন? যে-ছেলেটি হারিয়ে গেছে, সে-ছেলেটির মা নিজে ওই মুন্ডুটা দেখে বলেছেন, ওটা তাঁর ছেলের নয় আপনার সামনেই বলেছিলেন।

সমর দাস বলল, আমার মতে কেসটা বোগাস। আমি ঝাড়গ্রামে পোস্টেড ছিলাম, আমি জানি, এভাবে কেউ নরবলি দেয় না...পুজো-টুজোর সময়ে বলি দেওয়ার ওল্ড ট্র্যাডিশন যেখানে আছে..সেখানে ছাড়া..মাটি থেকে জল বার করার জন্য এখনও হয় রাজস্থানে, সাউথের দিকেও হয় দু-একটা। কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে...আমি অন্তত বিশ্বাস করি না..ছেলেটার জন্য জোর খোঁজ লাগিয়েছি।

দরখাস্তটা একটু দেখতে পারি?

কে কে সই করেছে, দেখে নিতে চান? হয়তো দেখবেন, আপনার আত্মীয়দের মধ্যেই কেউ ইন্টারেস্টেড পার্টি আছে...তবে সেটা তো আমাদের কাছে নেই, বললাম না, এস. পি. সাহেবের দফতরে জমা পড়েছে, ডি এস পি সাহেব নোটে লিখেছেন, পিপল খেপে আছে এইসময় আমরা যদি কোনো অ্যাকশন না নিই তাহলে হঠাৎ বড়োরকমের গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে...তখন কৈফিয়ত দিতে আমাদের জান বেরিয়ে যাবে।

আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করতে চান?

আমরা কেন তা করতে যাব? ডি এস পি সাহেবের কাছে আপনাকে পাঠাবার হুকুম হয়েছে, তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তারপর তিনি যা ভালো মনে করেন।

আপনার ডি এস পি-কে বলুন আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি কেন যাব?

আরে বসুন, বসুন। উঠে পড়ছেন কেন? ওসব কথা আপনারা মাঠেঘাটে লেকচারে বলতে পারেন, কিন্তু থানায় বসে বলা চলে না। আমরা হুকুম তামিল করি মাত্র। আজই আপনাকে পাঠিয়ে দিতাম...কিন্তু গাড়ি নেই, গাড়ি গেছে সদরে..রাত্তিরটা এখানেই থাকুন, কাল সকালে যাবেন!

রাত্তিরটা আমি এই থানায় থাকব?

আপনাকে হাজতে নোংরার মধ্যে থাকতে হবে না। এক ব্যাটা আবার সেখানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বমি করছে...আপনি এখানেই ঘরের মধ্যে বেঞ্চির ওপর শুয়ে থাকবেন...দিব্যি হাওয়া পাবেন।

সমর দাস বলল, আপনার পক্ষে সেটা তো ভালোই হবে...লোকে খেপে আছে...বললাম যাকে-তাকে ছেলেধরা ভেবে পেটাচ্ছে...হঠাৎ যদি আপনার ওপরে হামলা করে? আপনি নিজেই বললেন, আপনার বাড়িতে লোকেরা আগুন লাগাতে এসেছিল।

দ্বারিক চিৎকার করে বলল, আমি কক্ষনো এখানে থাকব না। আমার বাড়িতে শুধু দু-জন মেয়েছেলে...বাবা অসুস্থ...যদি ওরা আবার আসে...আমি এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

বড়োবাবু বললেন, সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, সে না হয় আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। গ্রামের দফাদার আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখবে...আপনি এখানে থাকুন। আপনার কিছু ভালো-মন্দ হলে তো জবাবদিহি করতে হবে আমাদেরই!

কোন অধিকারে আমাকে আপনারা আটকাচ্ছেন? আপনাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে আমার নামে?

কোশ্চেনিং-এর জন্য আপনাকে সদরে পাঠানো হবে, সেজন্য ওয়ারেন্ট লাগে? আপনি একটা পাকা লোক হয়ে এ-রকম কথা বলছেন?

আমি সত্যকিঙ্করবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি একবার যোগাযোগ করতে চাই।

কোন সত্যকিঙ্করবাবু? এম এল এ? তাঁকে পাবেন কোথায়? তিনি তো এখন কলকাতায়।

দ্বারিক অনুভব করল, এরা যেন তিনদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তার পিঠের কাছে দেওয়াল। তার আর বেরোবার রাস্তা নেই। সে একা একদম একা। সাহায্যের জন্য সে কার কাছে হাত বাড়াবে?

আপনি চা খাবেন, দ্বারিকবাবু?

দ্বারিক গর্জন করে উঠে বলল, না!

দ্বারিকের ইচ্ছে করল মাথার চুল ছিড়তে। কেন সে এখানে এল! পুলিশকে শত্রু ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি এতদিন, সেই পুলিশের কাছে সে কেন এসেছিল আগুন লাগাবার কথা জানাতে!

আমি না এলে আপনারা মোরামডাঙা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে আসতেন?

ধরে আনতাম বলাটা ভুল। ডেকে আনতাম। ডি এস পি সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

চুলোয় যাক আপনার ডি এস পি!

মাথাগরম করবেন না, দ্বারিকবাবু। তাতে কোনো লাভ হয় না। যান না, ওনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেই আসুন না। মানুষটা খুব ভদ্রলোক।

এরা ইচ্ছে করলে দ্বারিকের হাতে হাতকড়া পরাতে পারে, ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিতে পারে, তার বুকের ওপর বুটসুদ্ধ পা তুলে দাঁড়াতে পারে, ঠিক সাত বছর আগে যেরকম হয়েছিল। দ্বারিক কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না। পুলিশের বিরুদ্ধে কার কাছে সে নালিশ জানাবে?

দ্বারিক ভয় পাবে না, তবু তার সারাশরীরটা সংকুচিত হয়ে এল। যদি হঠাৎ মারতে আসে, যে-করেই হোক চোখ দুটো বাঁচাতে হবে। মনে পড়ল, স্বপ্নে দেখা ভুতোর সেই কালো মুখখানা।

আপনি ওই বেঞ্চিটাতে বসুন। যদি সন্ধ্যের মধ্যে গাড়িটা এসে যায়, তাহলে আজই আপনাকে পাঠিয়ে দেব...না হলে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবেন—একটু কষ্ট হবে আপনার।

দ্বারিক পুলিশ দু-জনের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না। এদের মুখের মিষ্টি কথাই সবচেয়ে ভয়ংকর, ঠিক মারবার আগের মুহূর্তে ওরা এ-রকমভাবে কথা বলে! এর চেয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডি এস পি-র কাছে চলে যাওয়াই তবু ভালো। সে-জায়গাটা তবু শহর, সেখানে কিছু ঘটলে চট করে জানাজানি হয়ে যায়। শহর আর গ্রাম দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। এখানে পুলিশ তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলে যদি দেহটা বাইরে ছুড়ে ফেলে। দেয়, তাতেও কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে না। তার নামে যেকোনো একটা অপবাদ চাপিয়ে দেবে। তা ছাড়া, সংঘর্ষ তো আছেই। শহরে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয় না, সবসময় হয় কোনো নাম না শোনা সুদূর গ্রামে। এখনও হয়।

দ্বারিক উঠে গিয়ে লম্বা বেঞ্চটায় বসল। পাশের একটা ঘর থেকে বমির ওয়াক ওয়াক শব্দ করছে কেউ। এরা দয়া করে তাকে ওই বমি-করা লোকটির সঙ্গে থাকতে দেয়নি। দয়া করে? অর্থাৎ এরা ওই লোকটাকেও সাক্ষী রাখতে চায় না। যা অত্যাচার, বা মারধোর করবে, সব এখানেই।

রামেশ্বর।

একজন হিন্দুস্থানি সেপাই এসে ঢুকল। বড়োবাবু তাকে বলল, দু-কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। দ্বারিকবাবু। দ্বারিকবাবু, আপনি চা খাবেন না তাহলে?

শব্দ না করে দ্বারিক দু-দিকে মাথা নাড়ল। এরা চা খেতে খেতে, সিগারেট টানতে টানতেও মারে। কাটোয়ার একজন সাবইনস্পেকটর যখন তার পেটে লাথি মেরেছিল, তখন সেই লোকটা একহাতে একটা জিলিপি ধরে খাচ্ছিল একটু একটু করে। তারপর সেই জিলিপির রস-লাগা আঙুল দ্বারিকের চুলে মুছে নেয়।

বাড়িতে মা আজ আবার একটা তুমুল কান্নাকাটি শুরু করবেন। বীথি আছে, সে একা আর কতটা সামলাতে পারবে। তবু ভাগ্যিস বীথি আছে, বীথির জন্য মা তবু অনেকখানি শান্তি পেয়েছেন। বাবা প্রায় পাগল, মা যখন-তখন কান্নাকাটি করেন, দ্বারিক একা কিছুতেই সামলাতে পারত না সংসারটা।...নিশীথরা দ্বারিককে লিখেছিল কলকাতায় চলে

আসতে...কলকাতায় গেলে ভালোই হত..নুটুও তাই বলল..কিন্তু ওরা কেউ তার বাড়ির কথাটা বোঝে না...বীথি, মা, বাবার কী ব্যবস্থা হবে..মা অনেক সংস্কার ত্যাগ করেছেন, জাতের ব্যাপারে আগে দারুণ গোঁড়ামি ছিল...দিদির বিয়ের সময় কোষ্ঠী মেলানো নিয়ে অনেক ঝাট করেছিলেন...রাঢ়ি আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের খুঁটিনাটি তফাতের জন্য অনেক সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছিল...সেই মা বীথিকে মেনে নিয়েছেন...প্রথম কিছুদিন বীথির হাতের জল খেতেন না...এখন আর সেসবও নেই...সরকার বাড়ির কুয়োর সামনে মা অন্যদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছেন পরশুদিন...দ্বারিক নিজের কানে শুনেছে যে মা বলছেন, বামুন শুদ্র কি কারোর গায়ের চামড়ায় লেখা থাকে? কত বামুন দেখলাম...ঘেন্না ঘেন্না...আমার ছেলের এত ভালো বউ হয়েছে, তাই লোকের চোখ টাটাচ্ছে...। মা দ্বারিককে বলেছিলেন দ্বারিক, আমাদের বাড়িতে একটা হাত-টিউকল বসাতে পারিস না? কত খরচ লাগে? আমার একজোড়া বালা আছে এখনও...কেন পরের বাড়ি থেকে জল আনতে যাব...। আজ যদি বাড়িতে এসে কেউ আবার হামলা করে? দ্বারিক বাড়িতে নেই জেনে গেলে...আসলে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই...এই যে থানায় তাকে জোর করে ধরে রাখা হল, এর বিরুদ্ধে সে কোনো আইনের ব্যবস্থাও নিতে পারবে না...প্রত্যেক অভিযুক্তেরই উকিলের সাহায্য নেওয়ার অধিকার আছে...কিন্তু এখানে উকিল কোথায়? এ তল্লাটে একটিও উকিল নেই...এরা তাকে অ্যারেস্ট করেনি, অথচ আটকে রেখেছে...গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের নাতি এখনও বেঁচে আছে তো?

মল্লিকপুরের ছেলেরা যেদিন ফিরল, সেদিন আপনি গিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে দেখা করতে?

পুলিশ জেনেশুনেই এই প্রশ্ন করছে, তবু দ্বারিকের মুখে উত্তরটা শুনতে চায়। দ্বারিক নিঃশব্দে সম্মতি জানালো।

আবার দল-টল গড়ছেন নাকি? তা গড়ন, সে ভালোকথা, কিন্তু স্কুল-স্টুল পোড়ানো...গরিব কনস্টেবলদের খুন করা...এসব যেন আবার শুরু করবেন না। গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করুন, দেশের লোককে আপনাদের বক্তব্য জানান।

দ্বারিকের মুখে তিক্ত হাসি এসে গেলেও দাঁতে দাঁত চেপে রইল। পুলিশও গণতন্ত্রের কথা শোনাবে! তাকে জোর করে, বেআইনিভাবে থানায় আটকে রেখে গণতন্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছে। মানুষের কান দুটো যদি বন্ধ করা সম্ভব হত, তাহলে সে এদের কথা শুনত না।

শুনলাম, বাড়িতে নাকি একটি রক্ষিতা রেখেছেন? বেশ ডাগর চেহারা!

দ্বারিক দু-হাতে মুখ ঢাকল। এরা তাকে খোঁচাচ্ছে, তাকে রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দ্বারিক একটু মেজাজ দেখালেই এরা মারতে শুরু করবে। শুধু চোর-ডাকাতদের মেরে এদের আনন্দ হয় না...ভদ্রলোকদের মেরেই এদের আসল হাতের সুখ হয়...কাটোয়ায় তার পায়ে দড়ি বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল, ভুতোর খবর জানবার জন্য...দ্বারিক তখন সত্যিই ভুতোর কোনো খবর জানত না, জানলেও নিজের ভাইকে কেউ ধরিয়ে দেয়? পুলিশের ভাই নেই? ওরা ওদের ভাইকে ভালোবাসে না?

বড়োবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একটু কোয়ার্টার থেকে ঘুরে আসছি...সমর তুমি থাকো...দ্বারিকবাবু, আপনি স্কুলে পড়ান, ভদ্রলোকের ছেলে, হঠাৎ যেন চলে-টলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না...ডি এস পি সাহেব এমনিতেই খাপ্পা হয়ে আছেন।

মারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে দ্বারিক সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। ঘুমের মধ্যেও তার ভুরু দুটো কুঁচকে আছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। জমাদার একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেল টেবিলের ওপর। ঘর ফাঁকা। সমর দাস বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে পাটালিগুড় নিয়ে দরাদরি করছে।

এইসময় থানার জিপগাড়িটা ফিরে এল সদর থেকে।

ও দ্বারিকবাবু, দেখুন কে এসেছে!

দ্বারিক চমকে জেগে উঠল, এ-রকম হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে।

সমর দাস একটা তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলের ঘাড় ধরে আছে। ছেলেটির মাথা ন্যাড়া। সদ্য ন্যাড়া হয়েছে মনে হয়, সারাগায়ে ধুলো। অল্প আলোতেও দ্বারিক সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল লীলাবউদির ছেলে বিটু।

দ্বারিক ভালো করে কথা বলতে পারল না প্রথমে। হঠাৎ ঘুম ভাঙার ঘোরটা যেন সে তাড়াতে পারছে না। সত্যিই বিটু? নাকি, সে স্বপ্ন দেখছে।

সমর দাস বলল, কতদূর গিয়েছিল ভাবুন...সেই অন্ডাল...দোকান থেকে খাবার চুরি করে ধরা পড়েছিল, লোকেরা ন্যাড়া করে, মাথায় ঘোল ঢেলে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল...দেখুন তো, এই সে কিনা, আপনাদেরই পাড়ার ছেলে তো।

দ্বারিক আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তড়াক করে উঠে এসে ঠাস ঠাস করে দুটো জোর থাপ্পড় কল বিটুকে।

হারামজাদা ছেলে! আমাদের সব্বাইকে জ্বালিয়েছিস!

সমর দাস হেসে বলল, তাহলে সেই ছেলেই..আমি তখনই বলেছিলাম ওসব গুজব... ভাগ্যিস চুরি করেছিল, তাই পুলিশের নজরে এল, নইলে স্টেশনে স্টেশনে ভিক্ষে করে বেড়াত।

দ্বারিক বিটুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, আহা রে...ক-দিন খাসনি? তুই কেন গিয়েছিলি, জানিস না, তোর মা তোর জন্য...

দ্বারিক আর কথা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ দারুণ কাশির দমক এসে গেল, কাশতে কাশতে বুক চেপে বসে পড়ল সে।

১১. সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে

সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। ঠিক বর্ষাকালের মতন। কিন্তু এটা নকল বর্ষা। শীতের শেষে কোনো কোনো বছর দু-একদিন এ-রকম বৃষ্টি হয়ে যায়। তারপরই দু-তিন মাস একটানা খরা। সেই সময়টায় একেবারে অসহ্য অবস্থা হয়।

দ্বারিকের মাথাটা ভীষণ ভারী হয়ে আছে। খুব সম্ভবত তার জ্বর আসছে। যে-করেই হোক জ্বরটা আটকাতেই হবে। এ সময় বিছানায় পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বাড়ির কারোকেই সে এখন কিছু জানাতে চায় না।

সকাল বেলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই দ্বারিক ঠিকমতন স্বাদ পায়নি। তখনই বুঝেছিল, একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে। বৃষ্টি না পড়লে, দ্বারিক খোলা হাওয়ায় খানিকটা ঘুরে আসত। আজ থেকে তার স্কুলে যাওয়ারও কথা ছিল! সে জানলার ধারে বসে বৃষ্টি দেখতে লাগল।

একটু আসব?

দ্বারিক মুখ ফিরিয়ে বীথিকে বলল, এসো! বোসো!

দু-দিনের বৃষ্টিতে পুকুরটায় খানিকটা জল হয়েছে। কাদাগোলা ভাবটা অবশ্য যায়নি। তবু দ্বারিক একটু আগে দেখেছে, বীথি পুকুর থেকে স্নান করে আসছে। পুকুরপাড় থেকে এতটা ভিজে কাপড়ে হেঁটে আসতে হয় বলে সে সকাল সকাল স্নান সেরে নেয়। বীথির স্নান নিয়ে সত্যিই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকারবাড়ির কুয়োর কাছে সে আর একদম যায় না। জল নিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছিল। আর কয়েকদিন পর তো পুকুরে একদমই জল থাকবে না। তখন বীথি কোথায় স্নান করবে? বাড়িতে একটা টিউবওয়েল না বসালেই নয়। টাকা জোগাড় করতে হবে।

বীথি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বলল, আমি ভাবছি...

দ্বারিক চেয়ে রইল বীথির দিকে।

আমি ভাবছি কাল-পরশু বহরমপুর চলে যাব। -র কাছ থেকে অনেকদিন চিঠি পাইনি। বেশ তো, ঘুরে এসো ক-দিন, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

পৌঁছে দিতে হবে না, আমাকে মল্লিকপুরে বাসে তুলে দিলেই...।

সে তুমি যেতে পারবে জানি, কিন্তু আমারও তো ইচ্ছে করতে পারে তোমার মায়ের হাতের রান্না খেয়ে আসতে।

বীথি কিছু বলল না, হাসল শুধু একটু।

আমার মাকে বলেছ?

এখনও বলিনি।

বেশ তো ঘুরে এসো না। আমি মাকে বলে দেব এখন।

ঘুরে...আসব?

তুমি...ওখানেই থেকে যেতে চাইছ?

ওখানে হয়তো চেষ্টা করলে কোনো স্কুলে কাজ-টাজ পাওয়া যায়...এখানে তো বিশেষ কোনো সুযোগ নেই।

দ্বারিক দু-এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। সে যেন মনে মনে বেশ কিছুদিন ধরেই কথাটার প্রতীক্ষা করছিল। একদিন-না-একদিন বীথি একথা বলবেই। সে লেখাপড়া শিখেছে, ছোট্টবেলা থেকে শহরে জীবন কাটিয়েছে, সে এইরকম একটা এঁদো পাড়াগাঁর নিস্তরঙ্গজীবনে নিছক একটা ঘরের বউ হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে কেন? ভুতো

এখানে থাকলে না হয় তবু অন্য কথা ছিল। ভুতো থাকলে অবশ্য নানারকম ব্যাপারে মাতিয়ে রাখত সবাইকে। ওরা শহরে গিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করেও থাকতে পারত।

তবু বীথি যখন সত্যিই চলে যাওয়ার কথা বলল, তখন দ্বারিক যেন বুকের মধ্যে পরাজয়ের শূন্যতা বোধ করল। বীথি জানে, তাকে কেন্দ্র করে নানারকম কোন্দল হচ্ছে। গ্রামে। বীথি কি চলে যাচ্ছে দ্বারিককে নিষ্কৃতি দিয়ে যাওয়ার জন্য?

বহরমপুরে অনেকে আমাকে চেনে...আমি যে স্কুলে পড়েছিলাম হয়তো সেখানে চেষ্টা করলেই একটা কাজ পাব...আপনি কী বলেন?

দ্বারিক কি না বলবে? সে কি তার ছোটোভাইয়ের স্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারে, তুমি চলে যেয়ো না, তুমি থাকো!

সেটাই তো উচিত মনে হয়, এখানে শুধু শুধু পড়ে থেকে...

ওখানে একটা কাজ পেলে এখান থেকে বাবা-মাকে মাঝে মাঝে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে রাখতে পারি।

দ্বারিক ফ্যাকাশেভাবে বলল, হ্যাঁ..ওরা বহুদিন কোথাও বেড়াতে যাননি...মা বোধ হয় বছর দশেক আগে একবার বর্ধমান গিয়েছিলেন, দিদির বিয়ের পর।

দিদিকে তো আমি দেখলামই না।

এমনকী হতে পারে যে শুধু স্নানের কষ্টের জন্যই বীথি হঠাৎ চলে যাওয়া ঠিক করল। অনেক ছোটোখাটো ব্যাপারও জীবনে এক-এক সময় খুব বড়ো হয়ে ওঠে। প্রায়ই নিরামিষ খাওয়া বীথি সহ্য করেছিল, কিন্তু জলের কষ্ট বোধ হয় আর সহ্য করতে পারছে না। প্রত্যেকদিন ভালোভাবে স্নান করা যার অভ্যেস, সে দিনের পর দিন স্নান না করে কিংবা নোংরা জলে কোনো কারণে মাথা ডুবিয়ে হয়তো কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না।

দ্বারিক কি বলবে, তুমি থাকো বীথি, আমি যে করেই হোক বাড়িতে শিগগিরই একটা টিউবওয়েল বসাব?

না। সে-কথাটা এখন বলা যায় না। স্যালো টিউবওয়েল বসিয়ে এদিকে সহজে জল পাওয়া যায় না। জল উঠলেও এক-দেড় বছরের মধ্যে শুকিয়ে যায়। গভীর করে কুয়ো খুঁড়লে কাজ হয়, কিন্তু তাতে অনেক খরচ।

তোমার এখানে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

আমি আমার অসুবিধের জন্য চলে যাচ্ছি না। আমার কিছু একটা কাজ-টাজ করা উচিত, এই কথা ভেবেই।

তা ঠিক!

বীথির সঙ্গে খোলাখুলি অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু এই ক-মাস এক বাড়িতে থেকেও সে কিছুতেই বীথির সঙ্গে সহজ হতে পারল না। ভুতো তার থেকে মাত্র তিন বছরের ছছাটো। ভুতোর স্ত্রীর সঙ্গে তার ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক হতে পারত। কিন্তু দ্বারিক আড়ষ্টতা কাটাতে পারল না!

কালকেই যাবে ঠিক করেছ?

যদি বৃষ্টিটা ছেড়ে যায়!

এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ চলবে না, আজই থেমে যাবে।

মা দু-বার বীথির নাম ধরে ডাকতেই বীথি উঠে পড়ল। দ্বারিক বলল, ঠিক আছে, মাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

নুটুও পরামর্শ দিয়েছিল বীথিকে তার মায়ের কাছে রেখে আসতে কিছুদিনের জন্য। জাতের প্রশ্ন নিয়ে গ্রামের লোকজন যে দ্বারিকদের প্রায় একঘরে করবার ব্যবস্থা করছে, সেটা কাটিয়ে দেওয়া তাহলে খুবই সহজ হয়।

কিন্তু সেটা কী হার স্বীকার নয়? ব্রাহ্মণের বাড়িতে শূদ্রের মেয়ে বউ হয়ে এলে গ্রামের লোক খেপে যাবে, আর সেটাই মেনে নিতে হবে? তাড়িয়ে দিতে হবে সেই মেয়েটিকে!

বিটু ফিরে আসায় দ্বারিক একটা কুৎসিত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিটু যদি ফিরে না আসত? অন্ডাল স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল ছেলেটা, খিদের জ্বালায় দোকান থেকে। খাবার চুরি করে ছুটে পালাতে গিয়েছিল। সেখানে ট্রেনে কাটা পড়তে পারত। তাহলে কোনো খবরই এসে পৌঁছোত না এখানে। কিংবা যদি আরও দূরে চলে যেত কোথাও! সব নিরুদ্দিষ্ট ছেলেরা তো ফেরে না। তাহলে সমস্ত দায়টা চাপত দ্বারিকের ঘাড়ে। গ্রামের লোক যে নরবলির গুজবটা বিশ্বাস করেছিল, এটা ভেবেই দ্বারিকের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

প্রথম রাউণ্ডে গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের হার হয়েছে। সেজন্য দ্বারিক দুঃখিত। ওঁর নাতিটি বাঁচেনি। আহা, হয়তো ছেলেটাকে বাঁচনো যেত, দ্বারিক কেন আর একটু জোর করল না!

হেরে গিয়ে গোষ্ঠ জ্যাঠামশাই আরও উগ্র হয়ে উঠেছেন। জাতের প্রশ্ন তুলে বেশি করে খ্যাপাচ্ছেন লোকজনকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এ গ্রামে কয়েক ঘর মাত্র বামুন। যারা বামুন নয়, তারাও মনে করে বামুনের ঘরে শূদ্র বউ এলে সমাজের দারুণ অমঙ্গল হয়। এ-বছর যদি ভালো বৃষ্টি না হয়, হয়তো সেই দায়ও চাপানো হবে দ্বারিকদের ঘাড়ে। তাদের পাপেই ভগবান রুষ্ট হয়েছেন। এই দেশ!

সুতরাং গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউণ্ডের লড়াইটা বাকি আছে। খুব সম্ভবত তিনি এবার দ্বারিকের স্কুলের চাকরিটা খাবার চেষ্টা করছেন।

এইসময় বীথি চলে গেলে দ্বারিকের সুবিধে হয়ে যায় খুবই। এমনকী দ্বারিকের মা-ও নিশ্চয়ই মনে মনে খুশি হবেন এতে। আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে! বীথি দ্বারিককে মুক্তি দেওয়ার জন্য চলে যাচ্ছে? দ্বারিকের মনটা খুব দমে গেল।

শরীরে মাঝে মাঝে কাঁপুনি লাগছে। জ্বরটা এসেই গেল বোধ হয়। দুর ছাই, ভালো লাগে। একটা চাদর টেনে গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল দ্বারিক।

বাড়িতে কারা আগুন লাগাতে এসেছিল, তা জানা যায়নি। এখনও সেই মীমাংসাটা বাকি আছে। ও কাজটা বোধ হয় গোষ্ঠ জ্যাঠামশাইয়ের নয়। উনি অত নীচে নামবেন না মনে হয়। মহাদেব সাহার মতিগতি এখনও বোঝা যাচ্ছে না। দ্বারিকের বিরুদ্ধে মহাদেব সাহা এখনও প্রকাশ্যে নামেনি। আড়ালে কলকাঠি নাড়তে পারে অবশ্য। দ্বারিক ওকেও ছাড়বে না। ডিপটিউবওয়েলের জল ভাগাভাগি করার সময় কিংবা ফসল কাটার সময় গোলমাল হবেই–

তখন মালোপাড়ার খেতমজুরদের সংঘবদ্ধ করে দ্বারিক মহাদেব সাহাকে এবার একটা সাংঘাতিক শিক্ষা দেবেই!

দ্বারিক নরবলি দেয়নি শুনে নাকি মালোপাড়ার লোকজনরা একটু নিরাশ হয়েছে। দ্বারিককেই তারা পরিত্রাতা ভেবেছিল!

জ্বরের কাঁপুনির মধ্যেও দ্বারিকের হাসি পেল।

বৃষ্টি ছেড়ে গেল দুপুরের দিকে। বিকেলের দিকে পরিষ্কার আকাশ আর পাতলা ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাসে সুন্দর হয়ে উঠল দিনটা। দ্বারিক তখনও ঘুমিয়েই রইল। মাঝখানে শুধু একবার উঠে কোনোরকমে খানিকটা ভাত খেয়ে নিয়েই আবার শুয়ে পড়েছিল। তাকে যেন অনন্ত ঘুমে পেয়েছে।

শেষ বিকেলের দিকে বীথি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। অনেক দিন পর। পথে যে দু চারজন লোক পড়লো, তারা চকিতে সরে গেল বীথিকে দেখে। যেন বীথির স্পর্শের হাওয়াতে দোষ আছে। সামনে থেকে নয়, পেছেন থেকে তারা বীথির শরীরে দৃষ্টি বিঁধিয়ে দিতে অবশ্য ছাড়ল না।

কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করল না বীথি। সে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে পড়ল মাঠে। তারপর আরও হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো সেই মরা নদীর খাতে।

এই কয়েকদিনের সামান্য বৃষ্টি এখানকার মাটি চোঁ চোঁ করে শুষে নিলেও খানিকটা জল জমেছে বীথির নিজের তৈরি করা ছোট্ট পুকুরে।

হাত দিয়ে কাদা মাটি লেপে লেপে পুকুরের চার দিক সমান করে দিল বীথি। বনতুলসীর গাছগুলোতে ফুল এসেছে। তার ইচ্ছে ছিল, রোজ এসে আরও খানিকটা খুঁড়ে খুঁড়ে এটাকে আর একটু বড়ো করে ফেলবে। তারপর মাছ ছাড়বে এখানে। তেলাপিয়া মাছ যে-কোনো জায়গায় বাঁচে। শুধু বর্ষার কয়েক মাস সবাই এ-রকম ছোটো ছোটো পুকুর খুঁড়ে সেখানে তেলাপিয়া মাছ ছাড়লেও তো খানিকটা মাছের সমস্যা মেটে।

কিন্তু বীথি এখানে আর আসবে না। কাল সে চলে যাবে। কয়েকদিন পরই বুজে যাবে এই পুকুরটা। কেউ কোনোদিন জানবেও না। বীথি এখানে কিছু একটা তৈরি করবার চেষ্টা করেছিল।

যদি তার মেয়েটা বাঁচত, তাহলে, সে একটু হাঁটতে শিখলেই বীথি তার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে নিয়ে আসত এখানে। ওকে তার এই পুকুরের মধ্যে বসিয়ে খেলতে দিতো।

বীথি তার কয়েক ফোঁটা কান্না মেশালে তার নিজের গড়া পুকুরের জলে।

লালবাগে তিনজন পুলিস সেদিন বীথিকে উলঙ্গ করে তার তলপেটে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিল, সেদিনই বীথি ভেবেছিল তার গর্ভের সন্তান বাঁচবে না। মনের মধ্যে আবার দুটো মন থাকে। একটা মন ওই কথা ভেবেছিল, আবার আর একটা মন দারুণভাবে আশা করছিল, না, মরবে না, বেঁচে থাকবে, স্বদেশ হালদারের একজন উত্তরাধিকারীকে সে এনে দেবে পৃথিবীতে।

পেঁজা তুলো তুলো মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলছে চাঁদের। বীথি খেয়ালই করে নি, কখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত এসে গেছে। তবু তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আর তো কখনো আসা হবে না এখানে।

সে বহরমপুরে ফিরে গিয়ে চাকরি করবে, কোনোদিন কি সেখানে তার সময় হবে কোনো মাঠের মধ্যে একলা গিয়ে বসার। ওখানে তো এত নিরালা নেই। বহরমপুরে কাজ না পেলে চলে যাবে কলকাতায়। তার পিসতুতো দিদি মমতা একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, সে বলেছিল, বীথিকে একটা কাজ দিতে পারে।

সকাল বেলা একঘেয়ে বৃষ্টির সময় কল্পনাই করা যায় নি যে আজ রাতে এ-রকম জ্যোৎস্না উঠবে। জোৎস্নায় ধপধপে দেখাচ্ছে মাঠটা। দূরে দূরে দু-চারটে খেজুর গাছ, তাও কত সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। কী শান্ত কোমল এই রাত। এই সময় এই সব গ্রাম্য জায়গাকেও কত মোহময় মনে হয়। বোঝাই যায় না যে এখানে ক্ষুধা আছে, দারিদ্র্য আছে, আর আছে মানুষের মনে অন্ধত্ব। যে অন্ধত্ব কোনো সৌন্দর্য দেখতেও জানে না।

ডিপটিউবওয়েলের জলের নালি কাটা হয়নি এই মাঠের দিকে। কোনদিকে, কার জমির পাশ দিয়ে নালি কাটা হবে, তা নিয়ে এরমধ্যেই খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেছে। বীথি সব জানে। আরও কত বছর, কত শতাব্দী এই মাঠটা এ-রকম পতিত, অনাবাদি হয়ে থাকবে কে জানে?

একটা কাঠি দিয়ে বীথি মাটির ওপর নিজের নামটা লেখার চেষ্টা করল। কাল-পরশুর মধ্যেই মুছে যাবে এই নামটা, যাক। এ জায়গাটা তার প্রিয় ছিল, সে-কথা বীথি শুধু এই জায়গাটাকেই জানিয়ে যেতে চায়।

লোক তিনটি নিঃশব্দেই আসবে ভেবেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বীথি তাদের পায়ের আওয়াজ টের পেয়ে যায়।

কে?

লোক তিনটি হুড়মুড় করে ছুটে এল বীথির দিকে।

মানুষ দেখে বীথি আর সহজে ভয় পায় না। এইটুকু জীবনে সে অনেক ভয়ের মুহূর্ত পেরিয়ে এসেছে।

সে প্রথমেই ভাবল, এরা কেন এসেছে? এরা কি তার ওপর বলাৎকার করবে, না তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

পরের মুহূর্তেই সে ভাবল, এরা পারবে না। এরা কিছুতেই পারবে না। সে বীথি হালদার, সে স্বদেশ হালদারের স্ত্রী।

সে উঠেই দৌড়োলো সামনের দিকে।

লোকগুলোর কাছে কোনো অস্ত্র নেই। একটা মেয়েকে ধরবার জন্য তিনজনের খালি হাতই যথেষ্ট ভেবেছে। ওরা ঠিক লোক নয়। বীথিরই প্রায় সমবয়েসি তিন যুবক। পা-জামা আর গেঞ্জি পরা।

ওরা গ্রামের দিক থেকে এসেছিল বলে বীথিকে ছুটতে হল উলটো দিকে। এদিকে অনেকখানি ছুটলে রণকালীপুর গ্রামে পৌঁছোনো যায়। ওই অবস্থাতেই বীথির মনে পড়ল, দ্বারিককে সে চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমোতে দেখে এসেছিল। বীথির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে

দ্বারিক কি তাকে খুঁজতে আসতে পারত না আজ? এই লোকগুলোই কি আগুন লাগাতে এসেছিল তাদের বাড়িতে?

একজন লোক এসে প্রায় ধরে ফেলল বীথিকে। বীথি এঁকে-বেঁকে দৌড়োতে লাগল। পারবে না, এরা কিছুতেই পারবে না, সে বলতে লাগল মনে মনে।

তিনজন ঘিরে আসছে তিনদিক থেকে। তার মধ্যে একজন হঠাৎ বীথির একটা হাত ধরে ফেলতেই বেগ সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল দু-জনেই। বীথি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে লোকটির হাত কামড়ে দিল। লোকটি অন্য হাতে একটা চড় মারল বীথির গালে। কিন্তু বীথি ততক্ষণে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে। বাকি দু-জন এসে পড়ার আগেই বীথি দৌড়োতে শুরু করল আবার।

এবার মোরামডাঙা গ্রামের দিকে। লোক তিনটেও ছুটে আসছে। সব ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে নিঃশব্দে। বীথিও চিৎকার করছে না। এখান থেকে চিৎকার করলেও তাদের বাড়ির কেউ শুনতে পাবে না। গ্রামের অন্য কেউ শুনতে পেলেও তাকে সাহায্য করতে আসবে কিনা সন্দেহ। এই গ্রামের লোকদের সম্পর্কে বীথির মনে একটা তীব্র ঘৃণা জন্মে গেছে। এরা তাকে মানুষ বলে মনে করেনি। শূদ্র মনে করেছে। এ গ্রামে আসবার আগে বীথি জানতও না যে শূদ্র হওয়া অপরাধ। তার বাবাকে বহরমপুরের কত লোক শ্রদ্ধা করেছে।

পারবে না, এরা কিছুতেই ধরতে পারবে না, বীথি মনে মনে বারবার এই কথা বলতে লাগল। কলেজ স্পোর্টসে প্রত্যেকবার কাপ পেয়েছে বীথি, তাকে এরা দৌড়ে হারাতে পারবে না। একবার বাড়ি পৌঁছে গেলেই আর কোনো চিন্তা নেই। এখনও দ্বারিকের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই কারোর। আর বেশি দূর নয়, দূরে দেখা যাচ্ছে আলো...।

তবু ওরা বীথিকে ধরে ফেলল। গ্রামের এইসব লোকেরা স্পোর্টসে নাম দেয় না। কিন্তু দৌড়োতে পারে। দুটো লোক দু-দিক থেকে চেপে ধরল বীথিকে। বীথি বনবিড়ালির মতন ওদের আঁচড়ে-কামড়ে মুক্তি পেতে চাইল। একটুক্ষণের জন্য আর একবার নিজেকে

ছাড়িয়ে নিল বীথি, আবার খানিকটা দূর গেল, আবার ধরা পড়ল। এবার দু-জন লোক বীথির দু হাতে মুচড়ে ধরে রইল, অন্যজন দুমদাম করে মারতে লাগল বীথির মুখে।

ওরা এখানে বলাৎকার করার জন্য আসেনি। ওরা বীথিকে ধরে নিয়ে গভীরতর মাঠের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বীথি চিৎকার করতে লাগল, না, না, আমি যাব না, আমায় খুন করে ফেলো, আমি কিছুতেই যাব না, আমাকে মেরে না ফেললে আমি যাব না–

দড়ি আনেনি ওরা, বীথিকে অজ্ঞান করে না ফেললে বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। বীথিকে মেরে মেরে ওরা অজ্ঞান করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বীথি জীবনে কম মার খায়নি, সে সহজে অজ্ঞান হবে না। সে পাগলের মতন হাত-পা ছুড়ে ওদের আটকাতে চাইছে।

এবার ব্যাপারটা অন্য একটি দিকে নাটকীয় মোড় নিল। একটি টর্চের আলো দেখা গেল দূরে, গোলমাল শুনে আলোটা বেশ দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

লাল রঙের ধুতি ও উড়নি পরা একজন দীর্ঘকায় মানুষ, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে একটা লাঠি। সঙ্গে আর একটি বেঁটে মতন হৃষ্টপুষ্ট লোক।

কে রে? কে রে? কোন হারামজাদা!

লোক তিনটে পালাবার আগেই গোষ্ঠ ভট্টাচার্য সেখানে এসে পড়লেন। ওরা ততক্ষণে বীথির হাত-পা ধরে প্রায় কাঁধে তুলে ফেলেছিল। কারোকে ডাকবার জন্য নয়, বীথি তখন নিজস্ব রাগেই চিৎকার করছিল। সাংঘাতিক মুষ্টিতে সে ধরে আছে একজনের মাথার চুল।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য হাতের লাঠি তুলে একজনের পিঠে মারলেন দড়াম করে। লোক তিনটি গোষ্ঠ ভট্টাচার্যকে দেখল, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে, বীথিকে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

দেখ তো, সুবল, ওরা কোন বাড়ির মেয়ের এমন সর্বনাশ করছিল?

এত মার খেয়েও বীথি জ্ঞান হারায়নি। তার হাতের মুঠোয় একজনের মাথার অনেকগুলো চুল। টর্চের আলোয় সে উঠে বসে বিস্রস্ত বসন ঠিক করল।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করল, এ ভুবন হালদারের ছোটো ছেলের বউ-না?

তাঁর সঙ্গীটি বলল, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

জানোয়ারের দল, মেরে ওদের মাথা ভেঙে দিতে হয়। তোমার কি বেশি চোট লেগেছে। মা? উঠতে পারবে? এই সুবল, দেখ না!

বীথি উঠে দাঁড়াল।

যাও মা, বাড়ি যাও। রাত-বিরেতে কি মাঠে-ঘাটে একলা আসতে হয়। তোমরা শহরের মেয়ে, গাঁ দেশের রীত প্রকৃত জান না।

বীথির সর্বাঙ্গ জ্বলছে। দু-চোখ দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঘৃণা, প্রতি রোমকূপে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রাগ। এই লোকটি এসে পড়ে তাকে অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু এই উপকারের সে রেয়াত করে না। এই লোকটির জন্যই তাকে চলে যেতে হচ্ছে গ্রাম ছেড়ে।

সে বলল, ওই লোকগুলোকে আপনি চেনেন?

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য বললেন, চিনি, প্রত্যেকটাকে চিনি। আশপাশের আট-দশখানা গ্রামের এমন কোনো লোক নেই, যাকে আমি চিনি না! ওই তিনটে তো নাম করা হারামজাদা! তোমরা যদি ওদের নামে মামলা করতে চাও আমি নিজে তোমাদের হয়ে সাক্ষী দেব! কিন্তু তাতে তো কোনো লাভ নেই। তাতে তোমার কলঙ্ক বাড়বে বই কমবে না! স্ত্রীলোকের নামে কলঙ্ক একবার রটলে তা আর ঘোচে না।

তবু ওদের শাস্তি পেতেই হবে!

শাস্তি ওদের আমিই দেব...তবে, তোমারও রাতবিরেতে এদিকে আসা উচিত হয়নি...এতে দুশ্চরিত্রদের লোভ দেখানো হয়...একটা কথা বলি, তোমাদের শহরে যা চলে, গ্রামে তো চলে না...এখানে তোমার স্বামী নেই, বাড়িতে জোয়ান ভাসুর, সে এখনও বিয়ে করেনি, লোকের মনে নানা কথা আসবেই...শহরে তোমরা ধর্ম, সমাজ সব উচ্ছন্নে দিয়েছ...ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচার সেখানে মর্যাদা পেয়েছে...কিন্তু গ্রামে আমরা প্রাচীন ধারাগুলো বজায় রাখবার চেষ্টা করছি, সেখানে তোমরা মাথা না গলালেও তো পার!

প্রাচীন ধারার মানে বুঝি শুধু কুসংস্কার? আপনারা চান গ্রামকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে। তাতে আপনাদের মতন লোকদের সুবিধে হয়। জাতের ব্যাপার নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, তারা মানুষের শত্রু।

এখন তক্ক করার সময় নয়। বাড়ি যাও, মা। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমি তক্ক করতেও চাই না। সুবলকে আমি টর্চ দিচ্ছি, সে তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

আমি নিজেই যেতে পারব।

বীথি খানিকটা গিয়েও আবার ফিরে এল। এসে দাঁড়াল গোষ্ঠ ভট্টাচার্যের একেবারে সামনে। স্পর্শ এড়াবার জন্য গোষ্ঠ ভট্টাচার্য একটু পিছিয়ে গেলেন।

বীথি বলল, একটা কথা আপনাকে বলে যাচ্ছি, শুনে রাখুন। এই সমাজ একদিন বদলাবেই। এই পচা-গলা সমাজ বেশিদিন টিকতে পারে না! শিগগিরই গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। সেদিন সেই সমাজের লোকরা আপনার মতন মানুষদের আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে!

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য উদারভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, তাহলে তোমাকেও একটা কথা বলি, শুনে রাখো। হয়তো এই সমাজ বদলাবে। তোমাদের কথামতন এক ধর্মহীন ও নীতিহীন সমাজ গড়ে উঠবে। সেখানে তোমরা জোরজুলুম করে সব লোককে শুধু খেতে

পরতে দিয়ে ঠাণ্ডা রাখবে, তাও মানলুম। কিন্তু এই বুড়ো বামুন বলে যাচ্ছে, সেই সমাজে তোমরা সুখ পাবে না, শান্তি পাবে না!

বীথি বলল, সুখ! এখনকার মানুষ বুঝি খুব সুখে আছে?

বাড়ি যাও। এই সুবল আলোটা দেখা–

বীথি প্রথমে কিছুটা হেঁটে, তারপর প্রায় দৌড়োতে শুরু করল। তার ঠোঁটের কোণ কেটে রক্ত পড়ছে, শরীরে আর কোনো জায়গায় ক্ষত হয়নি। বীথি আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল, তবু রক্ত বন্ধ হল না চট করে। বীথির শাড়িটার রং গাঢ় নীল, রক্ত লেগে থাকলেও চট করে বোঝা যাবে না। তবু, তার সারাগায়ে ধুলো, চুল অবিন্যস্ত। এতক্ষণ বীথি ভয় পায়নি, কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকে ভয় ভয় করতে লাগল। কেউ তাকে এই অবস্থায় দেখলে অন্যরকম ভাববে।

সোজা বাড়ি না ফিরে বীথি চলে এল পুকুরধারে। খানিকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। তার বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ থামতে বেশ সময় লাগল। লোকগুলো সত্যিই যদি তাকে ধরে নিয়ে যেত? লোকগুলো তাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল; বীথি সারারাত না ফিরলে দ্বারিক নিশ্চয়ই ছোটাছুটি করত চারদিকে। এমনিতেই দ্বারিকের সমস্যার অন্ত নেই।

গোষ্ঠ ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই ঘটনাটা বলে বেড়াবেন সবাইকে। তিনি এত বড়ো একটা বীরত্বের কাজ করেছেন, সে-কথা লোককে না জানিয়ে ছাড়বেন কেন? তিনি কতখানি রং চড়াবেন, তাই বা কে জানে! এরপর এ গ্রামে থাকা বীথির পক্ষে আরও শক্ত। কাল ভোরেই সে চলে যাবে। ভাগ্যিস কথাটা সে আজ সকালেই দ্বারিককে বলেছিল, দ্বারিক অন্তত বুঝতে পারবে যে শুধু এই ধরনের একটা বাইরের ঘটনার জন্যই বীথি চলে যাচ্ছে না।

যাওয়ার আগে এই ঘটনাটা কি বীথির নিজের মুখে জানানো উচিত, না উচিত নয়! বীথি কিছুতেই তা ঠিক করতে পারল না।

বীথি তার চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চিরুনির মতন চালিয়ে জট ছাড়াল, তারপর চুল বাঁধল। শাড়িটা খুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিল ভালো করে। ঠোঁটের কোণে রক্তটা জমে গেছে এখন, পুকুরের জলে ভালো করে ধুয়ে নিলে মুখ। সন্ধ্যের পর সাধারণত এখানে কেউ আসে না। কিন্তু এখন পুকুরপাড়ের সব কটি গাছকেই মনে হচ্ছে অবিশ্বাসী। প্রত্যেকটি গাছই যেন একজন করে শয়তানকে লুকিয়ে থাকবার আড়াল দিয়েছে। তারা বীথির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ওঁত পেতে আছে।

বারান্দায় পা দু-খানি ছড়িয়ে বসেছিলেন মা। বীথির দেরি করে ফেরা বিষয়ে কোনো কথা বললেন না।

বউমা, তুমি কাল চলে যাচ্ছ? সত্যি চলে যাচ্ছ?

কোনো দ্বিধা না করে বেশ স্পষ্টভাবে বীথি বলল, হ্যাঁ মা!

আর একটিও কথা হল না। প্রথমে নিঃশব্দে কেঁপে কেঁপে, তারপর শব্দ করে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

বীথি বুঝতে পারল, এই কান্না তার চলে যাওয়ার কারণে নয়, এই কান্না ওঁর ফিরে না আসা ছেলের জন্য। এখানে বীথির কোনো সান্ত্বনার ভাষা নেই। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেল ভেতরে।

নিজের ঘরে ঢোকবার আগে সে উঁকি মেরে দেখল, দ্বারিক এখন জেগে আছে। হ্যারিকেনের আলোয় পড়ছে একটা বই।

খাওয়ার সময়ও দ্বারিক বিশেষ কোনো কথা বলল না। মা কান্না থামিয়ে ফেলেছেন। নিজেই প্রসঙ্গটা তুলে বললেন, বউমা কাল কখন যাবে? একা একা এতটা পথ যেতে পারবে?

আসবার সময় যে বীথি একাই এসেছিল সে-কথা মা ভুলে গেছেন।

দ্বারিক বলল, আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। বেশি বেলা হয়ে গেলে মল্লিকপুরের বাসে বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়াই ভালো, সাতটার মধ্যে...।

সারাদিন ঘুমিয়েছে বলে দ্বারিকের সহজে ঘুম আসবে না। আজও বীথি তার খাওয়ার জল রেখে গেছে। কাল থেকে আর রাখবে না। জলের গেলাসটা রেখে বীথি একটুক্ষণ যেন দাঁড়িয়েছিল। সে কি কিছু বলতে চেয়েছিল? কিন্তু কিছু বলেনি। দ্বারিকও বলতে পারেনি কিছু। একটুক্ষণ চেয়েছিল তার দিকে। তারপর বীথি চলে গেল।

অথচ অনেক কথা বলার ছিল।

সারাদিন ঘুমিয়ে বেশ উপকার হয়েছে দ্বারিকের। জ্বর জ্বর ভাবটা ছেড়ে গেছে। দু-বার পড়া একটা প্রবন্ধের বই সে তৃতীয়বার পড়তে লাগল শুয়ে শুয়ে। পড়ায় মন না বসলেও সে জোর করে চোখ আটকে রাখছে বইয়ের পাতায়।

একসময় হ্যারিকেনের শিখা দপদপ করে উঠল। তেল ফুরিয়ে এসেছে। দ্বারিক ঘড়িতে দেখল, রাত সোওয়া একটা।

বীথির ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। বীথি তো সারাদুপুর ঘুমোয়নি, তবু এত রাত জেগে বই পড়ছে সে? কাল ভোরে জাগতে হবে। কোনো বই যদি তার শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তো অনায়াসেই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

দ্বারিক খাট থেকে নামল।

বীথি বই পড়ছে না। হ্যারিকেনটা জ্বালাই রয়েছে—পাশের টুলের ওপর, বীথি দু-হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুমিয়েই পড়েছে বোধ হয়।

আলোটা নিভিয়ে দেওয়া দরকার। দ্বারিক পা টিপে টিপে ঢুকল বীথির ঘরে। হ্যারিকেনটা তুলে নিতেই বীথি মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল।

তোমার সঙ্গে আমার দু-একটা কথা আছে, বীথি। হয়তো পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

বীথি উঠে বসল। দ্বারিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, প্রায় শব্দ না করে সদর দরজাটা খুলে চলে এল সামনের চত্বরে। বীথিও পেছন পেছন এসেছে।

ভুতোর তৈরি কাঠের গুঁড়ির বেঞ্চিটা দেখিয়ে বীথিকে সে বলল, বোসসা! তোমার ঘুম ভাঙালাম, না তুমি জেগেই ছিলে?

ঘুম আসছিল না।

দ্বারিক কোনখান দিয়ে কথা শুরু করবে, ভেবে পাচ্ছে না। অথচ তাকে কিছু কথা বলতেই হবে। স্কুল ফাইনালের প্রথম পরীক্ষার দিনে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শরীরটা যেমন অদ্ভুত হালকা লাগছিল, আজও যেন ঠিক সেইরকম অনুভূতি হচ্ছে দ্বারিকের।

নিজের কাছে আর অস্বীকার করার উপায় নেই দ্বারিকের, যে বীথির চলে যাওয়াটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। জাগ্রত অবস্থায় শুধু এই কথাটাই তার মাথায় ঘুরছে। এর কারণ কী? কয়েক মুহূর্ত আগে বীথির ঘরে ঢোকার সময় সে কারণটা স্পষ্ট টের পেয়েছে। বীথির সঙ্গে তার বেশি কথাবার্তা না হলেও, দ্বারিক জানত, বীথি তাকে বোঝে। বীথি দূর থেকে তাকে লক্ষ করে। তার অস্থিরতা, হতাশা, সংশয়ের কথা বীথি ঠিক টের পায়। প্রত্যেকদিন রাত্রে জলের গেলাস দিতে এসে বীথি যে দুটো-একটা কথা বলত, তাতেই বোঝা যেত যে, বীথি তার যন্ত্রণার ভাগ নিচ্ছে। এ গ্রামে আর একজনও কেউ নেই, যার সঙ্গে দ্বারিক মন খুলে কথা বলতে পারে। কাল বীথি চলে যাবে, কাল থেকে দ্বারিক সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ একা।

অথচ বীথির যাওয়াই তো উচিত। সে কেন এখানে পড়ে থেকে তার জীবনটা নষ্ট করবে? শুধু শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে সে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবনটা! বীথিকে আটকাবার চেষ্টা করা, দ্বারিকের পক্ষে স্বার্থপরতা।

তুমি একদিন বলেছিলে, ভুতো..মানে স্বদেশ তোমাকে এই গ্রামে এসে অপেক্ষা করতে বলেছে...সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি থাকবে...তখন আমি কিছু বলিনি, কিন্তু আজ বলা দরকার, ভুতো আর কখনো ফিরবে না।

বীথি চুপ করে দ্বারিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্বারিক চোখ নত করে বলল, কাল তুমি চলে যাচ্ছ, এবার তোমাকে খোলাখুলি বলা উচিত, তুমি নিশ্চয়ই খুব আঘাত পাবে...কিন্তু এই গোপনীয়তার বোঝা আর আমি বইতে পারছি না...ভুতো বেঁচে নেই!

বীথি একটুও চমকাল না। মৃদু গলায় বলল, আমি জানতাম।

দ্বারিকই চমকে উঠল সাংঘাতিকভাবে। এতদিন একথাটা সে মনে মনেও উচ্চারণ করতে ভয় পেয়েছে, পাছে বীথি জেনে যায়। অথচ বীথি তা আগে থেকেই জেনে বসে আছে!

তুমি কী করে জানলে? তুমি কবে জানলে?

এখানে আসবার আগেই...পুলিশ ওকে ধরতে পারেনি...ওর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গিপুরে...পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল না অন্য পার্টির ছেলেরা মেরেছিল, তা জানা যায়নি শেষ পর্যন্ত...ওর বন্ধুরা ওর বডি পুড়িয়ে ফেলে।

আমিও তাই শুনেছি..বিমল, কৌশিক, ভৃগু আর মন্টু—ওরা এই চারজন বন্ধু ওকে নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে.কৌশিক পরে ধরা পড়ে..জেলের মধ্যে গোপনে আমাকে এই খবর দেয়।

আশিসেরই ডাক নাম ভৃগু, যে আশিস এখানে এসেছিল।

আমাকে একথা তোমরা আগে বলোনি? অথচ আমি দিনের পর দিন...প্রথমে ভেবেছিলাম, মার কাছে খবরটা আস্তে আস্তে ভাঙব, মা সইতে পারবেন না...তারপর তুমি এসে পড়লে।

আমরা ভেবেছিলাম, আপনি জানেন না...আপনি হঠাৎ বেশি আঘাত পাবেন ভেবে...ওর বন্ধুরা সবাই জানে, আপনি আপনার ভাইকে দারুণ ভালোবাসতেন...

ভুতো চলে গিয়ে আমার প্রাণশক্তি অর্ধেক নিয়ে গেছে।

ও ধানবাদে লুকিয়েছিল, সেখানে থাকলে ধরা পড়ত না...কিন্তু ও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিল।

তোমাদের বিয়ে হয়েছিল...একদিন পুলিশ তোমাদের বাড়ি সার্চ করতে আসে, ভুতো আর উপায়ন্তর না দেখে, তোমাদের বিছানায় এক কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়ে...সেই জন্যই তোমার বাবা।

না তো! সেরকম কিছু তো হয়নি। ও বিয়ে করতে চায়নি, আমিই জোর করেছিলাম...ও সেই সময়টা প্রায় পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল...আমি ভেবেছিলাম আমি ওকে বাঁধতে পারব...কিছুটা স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা পেলে...কিন্তু ভুল, কিছুতেই ওকে আটকানো গেল ...এমারজেন্সি উঠে যাওয়ার পর আমি বলেছিলাম ওকে ধরা দিতে, ও শুনল না, আমার কথা না, কারোর কথা না...

ভীষণ জেদি ছেলে।

এখন কি মাকে বলবেন?

তুমি চলে গেলে...তারপর আস্তে আস্তে বলতেই হবে।

আমি কি আরও কিছুদিন থেকে যাব এখানে?

না, না, না, তুমি থাকবে কেন? তোমার আর থাকার কোনো মানেই হয় না...এতদিন কষ্ট করে থেকেছ, সেটাই আমি অবাক হয়ে ভাবছি এখন।

কষ্ট? আপনিও তো কত কষ্ট করে আছেন।

এটা আমার বাড়ি, আমার জায়গা...আমার তো এখানে কোনো কষ্ট হয় না।

আপনি বসুন।

না, দাঁড়িয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগছে...তুমি যদি আগে বলতে যে তুমি জান, তাহলে গোপনীয়তা আমরা দুজনে ভাগ করে নিতাম...কিংবা হয়তো ভালোই হয়েছে, মা-র কাছে ধরা পড়ে যেতাম আগেই...তুমি চমৎকার অভিনয় করেছ, আমি পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

আমিও বুঝতে পারিনি যে আপনি জানেন। স্বদেশ আমাকে বলেছিল, একবার ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, সেইজন্যই আমি এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, দু-এক সপ্তাহ পরেই ফিরে যাব...এসে দেখলাম, আপনি একা, সব কিছু সামলাতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছেন...তাই ভাবলাম যদি কিছু সাহায্য করতে পারি আমি...আপনাদের দুই ভাইয়ের মুখের আদল একদম একা।

তুমি অনেক সাহায্য করেছ!

ছাই সাহায্য করেছি!

তুমি জান না, বীথি, তুমি ছিলে বলেই আমি অনেক জোর পেয়েছি।

আমি কি আরও কিছুদিন থাকব? থাকতে পারি, কোনো তাড়া তো নেই।

না, না, না! এখানে থেকে তোমার সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আমার জন্যই আপনাকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে। হয়তো আরও হবে।

তোমার জন্য নয়। গ্রামের লোক আমাকে ভয় পায়...ওরা ভাবে আমি বুঝি আবার ছোটো ছোটো ছেলেদের খ্যাপাব...তাদের বিপজ্জনক পথে নিয়ে যাব..সেইজন্যই যেকোনো ছুতোয় ওরা আমাকে তাড়াতে চায়।

আমি যখন প্রথম আসি, তখন তো গ্রামের লোক কোনো আপত্তি করেনি, আমি কুয়ো থেকে জল এনেছি, তাও কেউ কিছু বলেনি...হঠাৎ এতদিন বাদে কেন সবাই আমার জাত নিয়ে...

সে-কথাটা আমিও ভেবেছি...এটাও গ্রাম্য সংস্কার..তুমি যতদিন..মানে যতদিন তোমার গর্ভে সন্তান ছিল, কেউ তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস করেনি...ভাবি-জননীর কোনো ক্ষতি করলে নিজেদের সংসারে অমঙ্গল হয়...এ-রকম একটা ধারণা আছে...এখন তো তুমি জননী নও।

একটা কথা বলব?

কী?

আমি চলে যাচ্ছি...আপনি এখানে একা থেকে কী করবেন? একা একা সবার সঙ্গে লড়াই করবেন কী করে? আপনিও চলুন...বড়ো কোনো জায়গায় আপনি কাজ করার অনেক সুযোগ পাবেন...ইচ্ছে করলে, বহরমপুরেও

দ্বারিক একটুক্ষণ চুপ করে রইল। সে অভাববোধ করল একটা সিগারেটের। কিন্তু সিগারেট আনবার জন্য আবার বাড়ির মধ্যে যেতে হবে। কোনোরকম শব্দ পেলে মা জেগে উঠতে পারেন। সিগারেট টানলে আবার কাশিও হবে। তার শরীরটা একটু একটু কাঁপছে।

তা হয় না!

বীথি নেমে পড়ল বেঞ্চটা থেকে। দ্বারিকের কাছে একটু এগিয়ে এসে বলল, আপনি মা বাবার কথা ভাবছেন? বহরমপুরেও স্কুল আছে...কিংবা অন্য কোনো যা তোক একটা কাজ আপনি ঠিকই পেয়ে যাবেন...মা-বাবাকে টাকা পাঠাতে পারবেন...পরে ইচ্ছে করলে মা বাবাকেও ওখানে কাছে নিয়ে রাখতে পারবেন, ওখানে গেলে পার্টির ছেলেদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগও হবে।

দ্বারিক খানিকটা কঠোরভাবে বলল, সে আমি যাব কিনা, পরে ভেবে দেখব। তুমি যাচ্ছ, এখনই আমার যাওয়া চলে না।

তুমি ঘরে যাও বীথি, শুয়ে পড়ো। কাল ভোরে উঠতে হবে।

আপনি যাবেন না?

আমি একটু পরে যাচ্ছি...আমার এখন ঘুম আসবে না, খানিকক্ষণ খোলা হাওয়ায় থাকলে আপনার জন্য আমার ভয় করে।

কেন?

আপনার শরীর ভালো নেই...আপনার মনের ওপর সাংঘাতিক চাপ...এখানে আপনার কোনো বন্ধু নেই...আমি দূরে চলে গেলেও আপনার জন্য...স্বদেশ আর ফিরবে না। কিন্তু আপনি..আপনার জন্যই আমি এতদিন এখানে ছিলাম।

দ্বারিক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার জন্য তোমার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই...আমি ঠিক থাকব...তুমি শুতে যাও, অনেক রাত হল।

বীথি দ্বিধা করতে লাগল। আজ সন্ধ্যের ঘটনাটা কি সে দ্বারিককে জানাবে? দ্বারিক পরে শুনতে পাবেই। সেই শয়তানগুলো ভাববে, বীথি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। ওই কথাটা মনে আসতেই বীথির রাগ হয়ে যাচ্ছে।

আমি যদি না যাই, যদি ঠিক করি এখানেই থাকব, তাও কি আপনি আমাকে চলে যেতে বলবেন জোর করে?

দ্বারিক অসহায়ভাবে বলল, তুমি অবুঝ হোয়য়া না বীথি...আমি মাকে...অন্যদের বলেছি তোমার চলে যাওয়ার কথা, তোমার এখন আর থাকা চলে না...তোমার চলে যাওয়াই ভালো, আমি বলছি, সেটাই তোমার পক্ষে সবদিক থেকে ঠিক...

বীথি ধীরপায়ে হেঁটে গেল বাড়ির দিকে। ভেতরে ঢুকে ভেজিয়ে রাখল সদর দরজাটা। কিন্তু নিজের ঘরের হ্যারিকেনটা নেভাল না। তার লালচে আলোর শিখা পড়ে রইল উঠোনে।

দ্বারিক পায়চারি করতে করতে সেই আলোটার দিকে তাকাতে লাগল বার বার। বীথি আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তারপর সে বাড়িতে ঢুকবে।

পায়চারি করতে করতে এক-একবার চলে যেতে লাগল আমবাগান পর্যন্ত, আবার ফিরে এল। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত না হয়ে পড়লে ঘুম আসবে না। সেইসময় একটা ঝড় বইছে, কিন্তু দ্বারিক এখন কিছুই ভাবতে চায় না? চিন্তার সব কটা জানলা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হলে সে তা-ই দিত। ভুতোর কথা বলে ফেলে শরীরটা অনেকখানি স্বচ্ছন্দ লাগছে।

দ্বারিক খুব মায়ার সঙ্গেই নিজের শরীরে হাত বুলোতে লাগল। স্বাস্থ্যটা এবার ভালো করে নিতেই হবে। সামনেই আসছে কঠোর গ্রীষ্ম, শরীর ভালো না থাকলে সে যুঝতে পারবে না। জলের ভাগবাটোয়ারা কিংবা ধান কাটার সময় ঝামেলা বাধবেই। দ্বারিকের সামনে এখন অনেক কাজ।

এই তার গ্রাম, এখানে সে জন্মেছে, জেল থেকে সে এখানেই ফিরে এসেছে। এখানে যদি সে হেরে যায় এখান থেকে যদি তাকে পালিয়ে যেতে হয়, তাহলে অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো বৃহত্তর জয়েরও কোনো মূল্য থাকবে না।

বীথি কাল চলে যাবে। কিন্তু দ্বারিককে থাকতে হবে এখানেই।